স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

ভক্তিপ্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

১. নারদ-ভক্তিসূত্র 3

২. ভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে 8

৩. ভক্তিযোগের উপদেশ 13

৪. ভক্তি-পথে শব্দের কার্যকারিতা 18

৫. জগতের কল্যান-সাধন 22

৬. বাহ্যপূজা 24

৭. উপাসক ও উপাস্য 36

৮. দিব্য প্রেম 47

৯. প্রেমের ধর্ম 57

১০. বিল্বমঙ্গল 62

১১. বাল-গোপালের কাহিনী 66

১২. শিষ্যের সাধনা 76

১৩. গুরুর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর 92

১৪. মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্য 94

১৫. ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা 95

১৬. ঈশ্বরঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত 96
১৭. ভগবৎ-প্রেম 98
১৮. মাতৃভাবে উপাসনা 101

১. নারদ-ভক্তিসূত্র

১৮৯৫ খ্রীঃ শরৎকালে মিঃ স্টার্ডির সহযোগিতায় স্বামীজী কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত।

[নারদীয় ভক্তি-সূত্র দশটি অনুবাকে বিভক্ত, ইহাতে মোট ৮৪টি সূত্র আছে। অনুবাক্ অনুসারে সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে—৬, ৮, ১০, ৯, ৯, ৮, ৭, ৯, ৭, ১১। স্বামীজী কয়েকটি সূত্র একসঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন, কয়েকটি বাদ দিয়াছেন । এখানে পাঁচটি পরিচ্ছেদে মোট ৬২টি সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা এখানে ইংরেজী অনুবাদে ব্যক্ত ভাব ও পরিচ্ছেদ-বিভাগ অনুসরণ করিয়াছি।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি।
২। ইহা প্রেমামৃত।
৩। ইহা লাভ করিলে মানুষ পূর্ণ হয়, অমর হয়, চিরতৃপ্তির অধিকারী হয়।
৪। ইহা লাভ করিলে মানুষ আর কিছুই চায় না এবং দ্বেষ ও অভিমান-শূন্য হয়।
৫। ইহা জানিয়া মানুষ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হয়, শান্ত হয়, এবং একমাত্র ভগবদ্বিষয়েই আনন্দ পাইয়া থাকে।
৬। কোন বাসনাপূরণের জন্য ইহাকে ব্যবহার করা চলে না, কারণ ইহা সর্ববিধ বাসনার নিবৃত্তি-স্বরূপ। ৭। ‘সন্ন্যাস’ বলিতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয়—এই উভয়বিধ উপাসনারই ত্যাগ বুঝায় ।
৮। যাহার সমগ্র সত্তা ঈশ্বরে নিবদ্ধ, সেই-ই ভক্তিপথের সন্ন্যাসী; যাহা কিছু তাহার ভগবদ্ভক্তির বিরোধী, তাহাই সে ত্যাগ করে।
৯। অন্য সব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়।
১০। জীবন সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতে হয়।
১১। নতুবা মুক্তির নামে অসদাচরণে বিপদ আছে।

১২। ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহরক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক আচরণই পরিত্যক্ত হয়।
১৩। ভক্তির অনেক সংজ্ঞা আছে; কিন্তু নারদের মতে ভক্তির চিহ্ন এইগুলিঃ যখন সকল চিন্তা, সকল বাক্য, সকল কর্ম ভগবানে সমর্পিত হয়; ভগবানকে স্বল্পক্ষণ বিস্মৃত হইলেও যখন অতি গভীর দুঃখের উদয় হয়, বুঝিতে হইবে তখন প্রেম-সঞ্চার শুরু হইয়াছে।
১৪। যেমন, এই প্রেম গোপীদের ছিল।
১৫। কারণ ভগবানকে প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করিলেও তাঁহার ভগবৎস্বরূপ তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই।
১৬। এরূপ না হইলে তাঁহারা অসতীত্ব-রূপ পাপের ভাগী হইতেন।
১৭। ইহাই ভক্তির সর্বোচ্চ রূপ। কারণ মানুষের সব ভালবাসায় প্রতিদানে কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ (রাজযোগ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর। কারণ ভক্তিই ভক্তির ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য।
২। খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে বা খাদ্যবস্তুর দর্শনে যেমন মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের প্রতি প্রেমের উদয় হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান, এমন কি ভগবদ্দর্শন হইলেও মানুষ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সেইজন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। যাহা হউক, সিদ্ধ ভক্তগণ ভক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেনঃ
২। যে ভক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, এমন কি মানুষের সঙ্গ পর্যন্ত অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।
৩। দিবারাত্র সে একমাত্র ভক্তির বিষয় ছাড়া আর অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না।

৪। যেখানে ভগবানের কীর্তন ও আলোচনা হয়, সেখানে তাহার যাওয়া উচিত।
৫। প্রধানতঃ মুক্ত মহাপুরুষের কৃপাতেই ভক্তিলাভ হয়।
৬। মহাপুরুষের সঙ্গলাভ দুর্লভ এবং আত্মার মুক্তি-বিধানে তাহা অমোঘ।
৭। ভগবৎকৃপায় এরূপ গুরুলাভ হয়।
৮। ভগবান্ ও ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে কোন ভেদ নাই।
৯। অতএব এরূপ মহাপুরুষদের কৃপালাভের চেষ্টা কর।
১০। অসৎসঙ্গ সর্বদা বর্জনীয়।
১১। কারণ উহা কাম-ক্রোধ বাড়াইয়া দেয়, মায়ায় বদ্ধ করে, উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়া দেয়, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা (অধ্যবসায়) নাশ করে এবং সবকিছুই ধ্বংস করিয়া দেয়।
১২। এই বিপত্তিগুলি প্রথমে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে আসিতে পারে, কিন্তু অসৎসঙ্গ এগুলিকে সমুদ্রাকারে পরিণত করে।
১৩। যে সকল আসক্তি ত্যাগ করিয়াছে, যে মহাপুরুষের সেবা করে, সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে একাকী বাস করে, যে গুণাতীত ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, সে-ই মায়ার পারে যাইতে পারে।
১৪। যে কর্মফল ত্যাগ করে, যে সর্ব কর্ম, সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব, এমন-কি শাস্ত্রজ্ঞানও পরিত্যাগ করে, সে-ই নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়।
১৫। সে ভবনদী পার হয়, এবং অপরকেও পার হইতে সাহায্য করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনার অতীত--অনির্বচনীয়।
২। মূক যেমন যাহা আস্বাদন করে, তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি মানুষ এই প্রেমের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, তবে তাহার আচরণে উহা প্রকাশ পায়।
৩। বিরল কোন ব্যক্তির জীবনে এই প্রেমের প্রকাশ ঘটে।

৪। সর্বগুণাতীত, সমস্ত বাসনার অতীত, চিরবর্ধমান, চিরবিচ্ছেদহীন, সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রেম।
৫। যখন মানুষ এই প্রেম-ভক্তি লাভ করে, তখন সে সর্বত্রই এই প্রেমের রূপ দর্শন করে, উহার কথাই শ্রবণ করে, উহাই কীর্তন করে এবং চিন্তা করে।
৬। গুণ ও অবস্থানুসারে এই প্রেম বিভিন্নভাবে নিজেকে বিকশিত করে।
৭। তম (মূঢ়তা, আলস্য), রজ (চঞ্চলতা, কর্মপ্রবণতা), সত্ত্ব (শান্তি, পবিত্রতা)—এগুলি গুণ; আর্ত (দুঃখী), অর্থার্থী (কোন কিছুর অভিলাষী), জিজ্ঞাসু (সত্যানুসন্ধিৎসু), জ্ঞানী (জ্ঞাতা)—এগুলি বিভিন্ন অবস্থা।
৮। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তগুলি পূর্বোক্তগুলি অপেক্ষা উচ্চতর।
৯। ভক্তিই উপাসনার সহজতম পথ।
১০। ইহা স্বতঃপ্রমাণ—প্রমাণের জন্য অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না।
১১। শান্তি ও পরমানন্দই ইহার প্রকৃতি।
১২। ভক্তি কখনও কাহারও বা কোন কিছুর অনিষ্ট করিতে চায় না, এমন কি প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতিরও নয়।
১৩। ভোগ-বিষয়ক, ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ-বিষয়ক, বা নিজের শত্রু-বিষয়ক প্রসঙ্গ কদাপি শুনিতে নাই। ১৪। অহঙ্কার, দম্ভ প্রভৃতি অবশ্যই পরিহার্য।
১৫। এই-সব রিপুকে যদি দমন করিতে না পার, তবে ঈশ্বরের দিকে এগুলির মোড় ফিরাইয়া দাও, সর্বকর্ম তাঁহাতে সমর্পণ কর।
১৬। প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে এক ভাবিয়া, নিজেকে ভগবানের চিরভৃত্য বা চিরবধূ ভাবিয়া ভগবানের সেবা কর; তাঁহাকে প্রেমনিবেদন এইভাবেই করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। যে প্রেম ভগবানে একাগ্র, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

২। ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে গেলে তাঁহাদের (এরূপ একনিষ্ঠ প্রেমিকদের) কথা কণ্ঠে রুদ্ধ হয়, তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলেন; তীর্থকে তাঁহারাই পবিত্র করেন; তাঁহাদের কর্ম শুভ; তাঁহারা সদ্গ্রন্থকে অধিকতর সদ্ভাবাপন্ন করিয়া তোলেন; কারণ তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে একাত্ম।

৩। কেহ যখন ভগবানকে এতখানি ভালবাসে, তখন তাহার পূর্বপুরুষগণ আনন্দ করেন, দেবগণ নৃত্য করেন, আর পৃথিবী একজন গুরুলাভ করে।

৪। এরূপ প্রেমিকের নিকট বংশ, লিঙ্গ, জ্ঞান, আকার, জন্ম ও সম্পদের কোন ভেদ থাকে না।

৫। কারণ এ-সবই তো ভগবানের।

৬। তর্ক বর্জনীয়।

৭। কারণ ইহার কোন শেষ নাই, কোন সন্তোষজনক ফল-লাভও ইহাতে হয় না।

৮। এমন গ্রন্থ পাঠ কর এবং এমন কর্ম কর—প্রেমভক্তি বর্ধিত হয়।

৯। সুখ-দুঃখের, লাভ-লোকসানের সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ভগবানের পূজা কর। একটি মুহূর্তও বৃথা নষ্ট করিও না।

১০। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দয়া ও দেবভাব সর্বদা পোষণ করিবে।

১১। অন্য সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া সমস্ত মন দিয়া দিবারাত্র ভগবানের পূজা করা উচিত। এভাবে রাত্রিদিন উপাসনা করিলে ভক্তের নিকট ভগবান্ প্রকাশিত হন, এবং ভক্তকে উপলব্ধির সামর্থ্য দান করেন।

১২। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রেম অপেক্ষা মহত্তর কিছু নাই। জগতের সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয় পরিহার করিয়া, প্রাচীন মহাপুরুষদের পন্থা অনুসরণ করিয়া আমরা এভাবে এই প্রেমভক্তির কথা প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি।

২. ভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে

দ্বৈতবাদী বলে, সর্বদা দণ্ডহস্তে শাসন করিতে উদ্যত একজন ঈশ্বরকে না ভাবিলে তুমি নীতিমান্ হইতে পার না। ব্যাপারটা কি রকম? ধর একটি ঘোড়া আমাদের নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবে। আর ঘোড়াটি ছ্যাকরা গাড়ীর হতভাগ্য ঘোড়া, সে চাবুক ভিন্ন এক পাও অগ্রসর হয় না—এইটি তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। এই ঘোড়ার বক্তৃতার বিষয় হইল 'মানুষ', তাহার মতে মানুষমাত্রই নীতিহীন। কেন? কারণ মানুষকে নিয়মিতভাবে চাবুক মারা হয় না। কিন্তু চাবুকের ভয় মানুষকে আরও নীতিহীন করিয়া তোলে।

তোমরা সকলে বলো যে, ঈশ্বর বলিয়া একটি সত্তা আছেন এবং তিনি সর্বব্যাপী। চক্ষু বন্ধ কর এবং চিন্তা করিতে থাক—ঈশ্বর কিরূপ। তুমি কি দেখিবে? যখনই তোমার মনে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের ভাবটি আনিবার চেষ্টা করিবে, তখনই দেখিবে সাগর, নীল আকাশ, বিস্তৃত বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর কিংবা এরূপ কোন বস্তু—যাহা তুমি পূর্বে দেখিয়াছ—তাহারই চিন্তা মনে উঠিতেছে। যদি তাই হয়, সর্বব্যাপী ভগবান্ সম্বন্ধে তোমার কোনই ধারণা নাই। 'সর্বব্যাপিত্ব' তোমার কাছে একটা অর্থহীন শব্দ। ঈশ্বরের অন্যান্য বিশেষণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কী ধারণা আছে? কিছুই নাই। উপলব্ধিই ধর্ম; যতক্ষণ না তুমি ঈশ্বর-ভাবটি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতেছ, ততক্ষণ আমি তোমাকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক বলিব না। উপলব্ধির আগে ইহা শুধু কথার কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মস্তিষ্কে যতই মত, দর্শন, ও নীতি-পুস্তকের রাশি সঞ্চিত রাখ না কেন, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তুমি কী উপলব্ধি করিয়াছ, জীবনে ঐগুলি কতটা পরিণত করিয়াছ, তাহাই বিচার্য।

মায়ার আবরণের ভিতর দিয়া দেখিলে নির্গুণ ব্রহ্মকেই সগুণ ঈশ্বররূপে দেখা যায়। ব্রহ্মকে যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করি, তখন তাঁহাকে একমাত্র সগুণ ভগবান্‌রূপেই দেখিতে পারি। আসল কথা পরমাত্মাকে কখনও বিষয়ীভূত করা যাইতে পারে না। জ্ঞাতা নিজেকে কি করিয়া জানিবেন? তবে তিনি যেন নিজের ছায়াকে প্রক্ষেপ করিতে পারেন এবং যদি

বলিতে চাও—ইহাকে ‘বিষয়ীভূত করা’ বলিতে পার। সুতরাং সেই ছায়ার যে সর্বোচ্চ রূপ, নিজেকে বিষয়ীভূত করিবার যে প্রচেষ্টা, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আত্মা হইতেছেন শাশ্বত কর্তা; সেই আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে রূপান্তরিত করিবার জন্য আমরা নিরন্তর চেষ্টা করিতেছি; এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা হইতে দৃশ্যজগতের ও যাহাকে আমরা ‘জড়’ বলি তাহার ও অন্যান্য সবকিছুর উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি অত্যন্ত দুর্বল প্রচেষ্টা এবং আমাদের কাছে আত্মার জ্ঞেয়রূপে যে সর্বোচ্চ প্রকাশ সম্ভব, তাহা সগুণ ঈশ্বর। এই জ্ঞেয়ই আমাদের স্বরূপ-উদ্ঘাটন-প্রচেষ্টার ফল। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এই-সব অভিজ্ঞতা পুরুষ বা জীবাত্মাকে দিতেছে; জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিবে। অদ্বৈত বেদান্তমতে জীব নিজেকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সে দেখে—জ্ঞাতা সর্বদা জ্ঞাতাই থাকেন; এবং তখনই অনাসক্তি আসে এবং জীব মুক্ত হয়।

যখন কোন সাধক সেই পূর্ণ অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনি সগুণ ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করেনঃ ‘আমি এবং আমার পিতা এক’। তিনি জানেন, তিনি পরব্রহ্মের সহিত; সগুণ ঈশ্বরের ন্যায় তিনি নিজেকে প্রক্ষেপ করেন। তিনি খেলা করেন, যেমন অতি পরাক্রান্ত রাজাও মাঝে মাঝে পুতুল লইয়া খেলা করেন।

স্থিতির বন্ধনকে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য কতকগুলি কল্পনা বাকী কল্পনাগুলির বন্ধন ছিন্ন করিতে সাহায্য করে। সমস্ত জগৎটাই একটা কল্পনা। এক শ্রেণীর কল্পনা আর এক শ্রেণীর কল্পনার উপশম ঘটায়। এই জগতে পাপ, দুঃখ ও মৃত্যু আছে—এই জাতীয় কল্পনাগুলি মারাত্মক। কিন্ত আর এক জাতীয় কল্পনা আছেঃ তুমি পবিত্র, ভগবান্ আছেন, দুঃখ নাই। এগুলিই ভাল এবং কল্যাণকর, বন্ধন-মোচনের সহায়ক। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই সর্বোচ্চ কল্পনা, যাহা শৃঙ্খলের সব গ্রন্থি ভাঙিয়া ফেলিতে পারে।

‘ভগবান্, তুমি ইহা রক্ষা কর এবং উহা আমাকে দাও; ভগবান্, আমি এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি, পরিবর্তে তুমি আমার দৈনন্দিন জীবনের অভাব পূরণ করিয়া দাও; হে ভগবান্, আমার মাথা-ধরা সারাইয়া দাও ইত্যাদি’—এইরূপ প্রার্থনা ভক্তি নয়। এগুলি ধর্মের নিম্নতম সোপান, কর্মের নিম্নতম রূপ। যদি কোন মানুষ দেহকে তৃপ্ত করিতে--

দেহের ক্ষুধা মিটাইতেই সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সহিত পশুর কি প্রভেদ? ভক্তি উচ্চতর বস্তু, স্বর্গৈষণা অপেক্ষাও উচ্চতর। স্বর্গ বলিতে খুব বেশী মাত্রায় ভোগ করিবার স্থান বুঝায়। তাহা কি করিয়া ভগবান্ হইতে পারে?

একমাত্র মূঢ় ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়-ভোগের পশ্চাতে ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক জীবন যাপন করা সহজ। পান-ভোজন-ক্রিয়ারূপ পুরাতন অভ্যস্ত পথে ভ্রমণ করা কঠিন নয়। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকগণ বলিতে চান, 'এই অনায়াস-সাধ্য ভাবগুলি গ্রহণ কর এবং সেগুলির উপরই ধর্মের ছাপ দিয়া দাও।' এই ধরনের মতবাদ বিপজ্জনক। ইন্দ্রিয়-ভোগে মৃত্যু। আধ্যাত্মিক স্তরে যে জীবন, তাহাই যথার্থ জীবন। অন্য ভোগভূমির জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। আমাদের এই জাগতিক জীবনকে একটি শব্দে বর্ণনা করা যাইতে পারে, উহা 'অভ্যাসের ব্যায়ামাগার'। যথার্থ জীবন উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে।

যতক্ষণ ছোঁয়াছুঁয়ি তোমার ধর্ম, এবং রান্নার হাঁড়ি তোমার ইষ্ট, ততক্ষণ তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। ধর্মে ধর্মে যে দ্বন্দ্ব—তাহা অর্থহীন, কেবল কথার সংঘর্ষ মাত্র। প্রত্যেকেই ভাবে, 'ইহা আমার মৌলিক চিন্তা'; এবং সে চায়—সবকিছুই তাহার মতানুসারে চলুক। এই ভাবেই ধর্মবিরোধের সূত্রপাত।

অপরকে সমালোচনা করিবার সময় আমরা সর্বদা নির্বোধের মত নিজের চরিত্রের একটি মাত্র বিশেষ উজ্জ্বল দিক্কেই সমগ্র জীবন বলিয়া ধরিয়া লই এবং উহার সহিত অপরের চরিত্রের অনুজ্জ্বল দিক্টি তুলনা করি। ব্যক্তিগত চরিত্র বিচার করিবার সময় আমরা এ-ভাবে ভুল করিয়া বসি।

গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা একটি ধর্মের অতি দ্রুত প্রচার হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ধর্মেরই প্রচার দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যে-ধর্ম প্রত্যেককে তাহার মতের স্বাধীনতা দেয় এবং এইরূপে তাহাকে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করে, যদিও এই প্রক্রিয়ার গতি মন্থর। সর্বপ্রথম দেশকে (ভারতবর্ষকে) আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর, তারপর

অন্যান্য ভাবগুলি আসিবে। ধর্ম ও অধ্যাত্মজ্ঞান-দান শ্রেষ্ঠ দান, কারণ ইহা অসংখ্য জন্মপ্রাপ্তি-রূপ বন্ধন মোচন করে। ইহার পর পার্থিব জ্ঞান-দান, ইহার সাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে মানুষের চক্ষু খুলিয়া যায়। তৃতীয় দান জীবন-দান এবং চতুর্থ অন্ন-দান।

সাধন করিতে করিতে যদি শরীরের পতন হয়, তবে তাহাই হউক। তাহাতে কি আসে যায়? নিরন্তর সৎসঙ্গের দ্বারা কাল পূর্ণ হইলে ঈশ্বরানুভূতি হইবে। একটা সময় আসে, যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, মানবসেবার জন্য এক ছিলিম তামাক সাজা লক্ষ লক্ষ ধ্যান জপ অপেক্ষা বড় কাজ। যে এক ছিলিম তামাক ঠিকভাবে সাজিতে পারে, সে ধ্যানও ঠিকমত করিতে পারে।

দেবতারা উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত পরলোকগত জীবাত্মা ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা সাহায্য পাইতে পারি।

তিনিই আচার্য, যাঁহার ভিতর দিযা ঐশী শক্তি ক্রিয়া করে। যে-শরীরের মাধ্যমে আচার্যত্ব লাভ হয়, তাহা অপর সাধারণ লোকের শরীর হইতে ভিন্ন। সে-শরীরকে ঠিকভাবে রাখিবার জন্য একটি বিশেষ যোগ বা বিজ্ঞান আছে। আচার্যের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত কোমল ও মন অতি সংবেদনশীল, ফলে তিনি সুখ ও দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন। বস্তুতঃ তিনি অ-সাধারণ।

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হৃদয়বান্ মানুষই জয়লাভ করে এবং ব্যক্তিত্বই সকল সাফল্যের গোপন রহস্য।

নদীয়ার অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মহাভাবের যেমন বিকাশ হইয়াছিল, তেমনটি আর কোথাও হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শক্তি। কখনও মনে করিও না যে, এটি বা ওটি তাঁহার মত ছিল। কিন্তু তিনি একটি শক্তি, সেই শক্তি এখনও তাঁহার শিষ্যদের ভিতর মূর্ত হইয়া আছে এবং

জগতে কার্য করিতেছে। ভাবের দিক্ দিয়া তিনি এখনও বাড়িয়া চলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একই দেহে জীবন্মুক্ত ও আচার্য ছিলেন।

৩. ভক্তিযোগের উপদেশ

রাজযোগ এবং শারীরিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন ভক্তিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কোন একটি যোগই অপরিহার্য নয়। আমি তোমাদের নিকট অনেকগুলি পদ্ধতি এবং আদর্শ উপস্থাপিত করিতে চাই, যাহাতে তোমরা নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী একটি বাছিয়া লইতে পার; একটি উপযোগ না হইলে অপরটি হয়তো হইতে পারে।

আমরা আমাদের চরিত্রের আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং ব্যাবহারিক—প্রত্যেকটি দিক্ সমভাবে উন্নত করিয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হইতে চাই। বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে কোন একটি ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তদতিরিক্ত কোন ভাব বুঝিতে পারে না। একটি ভাবেই তাহারা এরূপ অভ্যস্ত হয় যে, অন্য কোনটির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি যায় না। সর্বতোমুখী হওয়াই আমাদের প্রকৃত আদর্শ। বস্তুতঃ জাগতিক দুঃখের কারণ—আমরা এতদূর একদেশদর্শী যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি না। মনে কর, কোন ব্যক্তি ভূগর্ভস্থ খনি হইতে সূর্যকে নিরীক্ষণ করিল, সে সূর্যকে একভাবে দেখিবে। এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে দেখিল, একজন কুয়াশার ভিতর দিয়া এবং একজন পর্বতের উপর হইতে নিরীক্ষণ করিল। প্রত্যেকের নিকট সূর্যের বিভিন্ন রূপ প্রতিভাত হইবে। নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সূর্য একই। দৃষ্টি বিভিন্ন হইলেও বস্তু এক, এবং তাহা হইল সূর্য।

প্রত্যেক মানুষের স্বভাব অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রবণতা থাকে। সে ঐ প্রবণতা অনুযায়ী কোন আদর্শ এবং আদর্শে উপনীত হইবার কোন পথ গ্রহণ করে। লক্ষ্য কিন্তু সর্বদাই সকলের জন্য এক। রোম্যান ক্যাথলিকরা গভীর ও আধ্যাত্মিক, কিন্তু উদারতা হারাইয়াছে। ইউনিটেরিয়ানরা উদার, কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিকতা নাই, তাহারা ধর্মের উপর পুরোপুরি গুরুত্ব দেয় না। আমরা চাই—রোমান ক্যাথলিকদের গভীরতা এবং ইউনিটেরিয়ানদের উদারতা। আমরা আকাশের মত উদার এবং সমুদ্রের মত গভীর হইব;

আমাদের মধ্যে থাকিবে অতিশয় ঐকান্তিক উৎসাহ, অতীন্দ্রিয়বাদীর গভীরতা এবং অজ্ঞেয়বাদীর উদারতা।

দাম্ভিক ব্যক্তির নিকট 'পরধর্ম-সহিষ্ণুতা' শব্দটি এক অপ্রীতিকর মনোভাবের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে নিজেকে উচ্চাসনে বসাইয়া স্বজাতীয়দের করুণার চোখে দেখিয়া থাকে। উহা মনের এক ভয়াবহ অবস্থা। আমরা সকলেই একই পথে একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, কেবল ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতেছি। আমাদের মধ্যে বহু ভাবের সমাবেশ থাকিবে। চরিত্রে আমরা অবশ্যই বিকাশশীল হইব। আমাদের কেবল অপরের মতগুলি সহ্য করিলেই চলিবে না, উহা অপেক্ষা কঠিনতর কার্য করিতে হইবে—আমাদিগকে সমবেদনা প্রকাশ করিতে হইবে, অপরের অবলম্বিত পথে প্রবেশ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা ও ঈশ্বরান্বেষণ-প্রচেষ্টার সহিত সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। প্রত্যেক ধর্মের দুইটি ভাব আছে—ইতিবাচক ও নেতিবাচক। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন আপনারা খ্রীষ্টধর্মের অবতারবাদ, ত্রিত্ববাদ, যীশুর মাধ্যমে মুক্তিলাভ ইত্যাদি বলেন, তখন আমি আপনাদের সহিত একমত। আমি বলিব—অতি উত্তম, আমিও উহা সত্য বলিয়া জানি। কিন্তু যখনই আপনারা বলিতে থাকিবেন, 'আর কোন প্রকৃত ধর্ম নাই, ঈশ্বরের আর কোন প্রকাশ নাই', তখন আমি বলিব—থামুন, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত নই। প্রত্যেক ধর্মেরই প্রচার করিবার, মানুষকে শিক্ষা দিবার মত বাণী আছে। কিন্তু যখনই ধর্ম প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে, অন্যকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে, তখনই উহা নেতিবাচক ও ভয়াবহ মনোভাব অবলম্বন করে এবং কোথা হইতে আরম্ভ করিবে, কোথায় বা শেষ করিবে—জানে না।

শক্তি-মাত্রই আবর্তিত হয়। যে শক্তিকে আমরা 'মানুষ' বলি, তাহা অনন্ত ঈশ্বর হইতে যাত্রা শুরু করে এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া আসিবে। ঈশ্বর-সমীপে প্রত্যাবর্তনের জন্য দুইটি পন্থার একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রকৃতির সঙ্গে মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলা, অথবা অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে গতিপথে থামিয়া যাওয়া; এই অন্তঃ-শক্তি অপ্রতিহত থাকিলে

আমাদিগকে চক্র-পথে ঈশ্বর-সমীপে ফিরিয়া লইয়া যাইবে, এবং যেন প্রবলবেগে ঘুরিয়া সল্পদূরত্বের পথে ঈশ্বর-দর্শন করাইবে। যোগীরা এই পথেই গিয়া থাকেন।

আমি বলিয়াছি, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী আদর্শ নিরূপণ করিবে। এই আদর্শকে তাহার 'ইষ্ট' বলা হয়। ইহাকে অবশ্যই পবিত্র—অতএব গোপনীয় রাখিতে হইবে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করিলে ইষ্টভাবেই করিবে। ঐ বিশিষ্ট পন্থা নিরূপণের উপায় কি? ইহা অতীব দুরূহ, কিন্তু উপাসনায় অধ্যবসায়ী হইলে উহা আপনা হইতে প্রকাশ পাইবে। মানুষের নিকট ভগবানের তিনটি বিশেষ দান আছে—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষ-সংশ্রয়।

সগুণ ঈশ্বর ব্যতিরেকে আমাদের ভক্তিভাব আসিতে পারে না। প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ দুই-ই প্রয়োজন। ঈশ্বরকে অনন্তগুণসম্পন্ন মানব বলা যাইতে পারে। তিনি এরূপ হইতে বাধ্য, কারণ যতক্ষণ আমরা মনুষ্যদেহধারী, আমাদের ঈশ্বরও মনুষ্যরূপী হইবেন। সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা না করিয়া আমরা পারি না। ভাবিয়া দেখুন, জগতের কোন বস্তুকেই আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুরূপে চিন্তা করিতে পারি না। সর্বত্রই আমরা বস্তুর সঙ্গে স্বীয় মনকে সংযুক্ত করিয়া লই। বস্তুতঃ প্রকৃত চেয়ার হইতেছে—চেয়ার ও মনের উপর চেয়ার-বস্তুটির প্রতিক্রিয়ার সংযোগ। প্রতিটি বস্তুকে প্রথমে মনের দ্বারা রঞ্জিত করিতে হইবে, উদাহরণস্বরূপ—সাদা, চারকোণা, উজ্জ্বল, শক্ত বাক্সটি কেহ তিনটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিল, কেহ চারিটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, অপর একজন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিল। শেষোক্ত ব্যক্তিই বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকে ক্রমে ক্রমে একটি অধিক গুণ-সমন্বিত দেখিতে পাইল। এইরূপে যদি কোন ব্যক্তি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই একই বাক্সটি দেখে, সে উহাতে অতিরিক্ত আর একটি গুণ দেখিতে পাইবে।

আমি প্রেম ও জ্ঞান দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই জানি যে, জগৎ-কারণ সেই প্রেম ও জ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন। যাহা আমার মধ্যে প্রেম সৃষ্টি করিল, তাহা কিরূপে প্রেমশূন্য হইতে পারে? জগৎ-কারণকে আমরা মনুষ্যগুণবর্জিত চিন্তা করিতে পারি না। সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে ঈশ্বরকে পৃথগ্‌ভাবে দেখার আবশ্যকতা আছে। ঈশ্বরকে তিনভাবে চিন্তা

করা যায়ঃ নিম্নতম ভাব—যখন আমরা ঈশ্বরকে আমাদেরই মত দেহধারী দেখিতে পাই, রোমক শিল্পকলা দেখুন; উচ্চতর ভাব—যখন ঈশ্বরের মধ্যে মানবের গুণাবলী আরোপ করি এবং এইভাবে চলিতে থাকি। সর্বশেষ উচ্চতম ভাব—তাঁহাকে ঈশ্বররূপে দেখি।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সকল ধাপেই আমরা ঈশ্বর এবং কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। সেখানে কোন মিথ্যা কল্পনা বা ভ্রান্তি নাই। যেমন সূর্য বিভিন্ন দূরত্ব হইতে দৃষ্ট হইলেও তাহা সূর্যই—চন্দ্র বা অন্য কোন পদার্থ নয়।

আমরা ঈশ্বরকে আমাদেরই অনুরূপ না দেখিয়া পারি না—তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা অনন্তগুণসম্পন্ন দেখিলেও আমাদেরই মত ধরিয়া লই। আমরা নিরপেক্ষ অনন্ত ঈশ্বরের চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য আপেক্ষিক ভূমিতে নামিয়া আসি।

প্রত্যেক ধর্মেই ভগবানের প্রতি ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত; এক প্রকারের ভক্তি—মূর্তি আচার-অনুষ্ঠান ও শব্দের মাধ্যমে, অন্যরূপ ভক্তি—প্রেমের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জগতে আমরা নানা নিয়মে বদ্ধ, আর এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা মুক্ত হইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেছি, প্রকৃতিকে অমান্য করিতে এবং পদদলিত করিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ—প্রকৃতি আমাদের বাসস্থান দেয় না, আমরা উহা নির্মাণ করিয়া লই। প্রকৃতি আমাদিগকে অনাবৃতভাবেই সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা বস্ত্রদ্বারা নিজেদের আবৃত করিয়াছি। মানুষের লক্ষ্য হইল মুক্ত হওয়া; যে পরিমাণে আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, সেই পরিমাণে আমাদের কষ্ট ভোগ করিতেই হইবে। নিয়মের বাহিরে যাইবার জন্যই আমরা প্রথমে নিয়ম মানিয়া চলি, নিয়ম মানিয়া না চলাই হইল সমগ্র জীবনের সংগ্রাম। এই কারণেই আমি ‘ক্রিশ্চান সায়াণ্টিস্ট’দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকি; তাঁহারা মানবের স্বাধীনতা ও আত্মার দেবত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আত্মা সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বে। ‘এই জগৎ আমার পিতার রাজ্য, আমিই ইহার উত্তরাধিকারী’—এই ভাবটি মানুষকে গ্রহণ করিতে হইবে। ‘আমার নিজ আত্মা সকলকে জয় করিতে পারে।’

মুক্তি লাভ করিবার পূর্বে আমাদিগকে নিয়মের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বাহিরের সাহায্য, প্রণালী, আচার-অনুষ্ঠান, মত, পথ প্রভৃতির নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে; যতদিন না আমরা সাধনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হই, ততদিন এগুলি আমাদের সাহায্য করিবে এবং শক্তি দিবে। পরে আর ঐগুলির প্রয়োজন থাকে না। এগুলি যেন আমাদের ধাত্রীস্থানীয়, অতএব শৈশবে অপরিহার্য। গ্রন্থাদিও ধাত্রীর কাজই করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করিয়া সেই অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, যেখানে মানুষ উপলব্ধি করিবে, সে তাহার শরীরের প্রভু। গাছ-গাছড়া, ঔষধ প্রভৃতির প্রভাব আমাদের উপর ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ আমরা ঐগুলির সাহায্য স্বীকার করি; সবল হইলে বাহিরের নিয়ম-পদ্ধতির কোন আবশ্যকতা থাকে না।

৪. ভক্তি-পথে শব্দের কার্যকারিতা

দেহ মনেরই স্থূল রূপ মাত্র। মন কতকগুলি সূক্ষ্ম স্তর আর দেহ কতকগুলি স্থূল স্তরের দ্বারা গঠিত। মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইলে মানুষ দেহও বশীভূত করিতে পারে। প্রত্যেক মনের যেমন বিশেষ দেহ থাকে, তেমনি প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ চিন্তা বা ভাব আছে। ক্রুদ্ধ হইলে আমরা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করি– 'আহাম্মক', 'মূর্খ' ইত্যাদি; আবার দুঃখিত হইলে কোমল হ্রস্ব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি– 'আহা!' এগুলি অবশ্য ক্ষণিক মনোভাব মাত্র; কিন্তু প্রেম, শান্তি, স্থৈর্য, আনন্দ, পবিত্রতা প্রভৃতি সকল ধর্মেই কতকগুলি চিরন্তন মনোভাব আছে। ঐ-সকল ভাব প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট শব্দরাশি আছে। মানুষের উচ্চতম ভাবরাশির একমাত্র প্রতীক হইতেছে শব্দ। শব্দ চিন্তা হইতে জাত। আবার এই শব্দগুলি হইতে চিন্তারাশি বা ভাবরাশি জাত। এখানেই শব্দের সাহায্য প্রয়োজন। এরূপ শব্দগুলির প্রত্যেকটি শব্দ যেন এক-একটি প্রতীক। এ-সকল রহস্যপূর্ণ পবিত্র শব্দরাশি আমরা জানি এবং বুঝিতে পারি, কিন্তু কেবল গ্রন্থাদিতে পড়িলেই ঐগুলি আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। শব্দগুলি ভাবপূর্ণ হইলে এবং সাধনা করিয়া যিনি স্বয়ং ভগবানের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন এবং এখনও ভাগবত জীবন যাপন করেন, এরূপ ব্যক্তির স্পর্শ থাকিলে ঐগুলি ফলপ্রদ হয়। একমাত্র তিনিই ঐ ভাব-প্রবাহকে গতিদান করিতে সমর্থ। খ্রীষ্ট-দ্বারা চালিত প্রবাহ-পথেই শক্তিসঞ্চারের কার্য চলিয়া আসিতেছে। যাঁহার মধ্যে এই শক্তি-সঞ্চারের ক্ষমতা আছে, তিনিই গুরু। উত্তম আচার্যদের ঐ শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, যেমন যীশুখ্রীষ্টের। সাধারণ আচার্যগণও শব্দের মাধ্যমে এই শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অপরের দোষ দেখিবে না। দোষ দেখিয়া কাহাকেও বিচার করা যায় না। এ যেন ভূমিতে পতিত পচা অপক্ক অপরিণত আপেলগুলি দেখিয়া গাছটির বিচার করা। এইভাবে মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি দ্বারা তাহার চরিত্রের বিচার হইতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, দুষ্টলোক পৃথিবীর সর্বত্রই একরূপ। চোর এবং হত্যাকারী এশিয়া, আমেরিকা ও ইওরোপে

সমভাবেই দেখা যায়। তাহারা নিজেদের লইয়া একটি স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। সৎ, পবিত্র ও সরল ব্যক্তিদের মধ্যেই বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। অপরের মধ্যে অসাধুতা দেখিবার চেষ্টা করিও না। অজ্ঞতা ও দুর্বলতাই হইল অসাধুতা। মানুষকে দুর্বল বলিয়া লাভ কি? সমালোচনা আর ধ্বংসমূলক আলোচনা নিষ্ফল। মানুষকে উচ্চতর কিছু দিতে হইবে। তাহাকে তাহার মহৎ স্বভাব ও জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে অবহিত কর। আরও অধিক লোক কেন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না? কারণ খুব কম লোকই পঞ্চেন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন আনন্দের সংবাদ রাখে। অধিকাংশ ব্যক্তিই অন্তর্জগতের ব্যাপার—চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, কর্ণ দ্বারা শুনিতে পায় না।

এখন আমরা 'প্রেমের মধ্য দিয়া উপাসনা' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বলা হয় যে, 'গির্জায় অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ে জন্মানো ভাল, কিন্তু সেখানে মরা ভাল নয়।' চারাগাছ চারিপার্শ্বের বেড়া হইতে সহায়তা এবং আশ্রয় লাভ করে, কিন্তু কালে সেই বেড়া তুলিয়া না লইলে বৃক্ষটি সবল হইতে বা বাড়িতে পারিবে না। বাহ্য পূজা যে একটি প্রয়োজনীয় সোপান, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সেই সোপান অতিক্রম করিয়া উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ কর। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ প্রেম হইলে তিনি যে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্—এ-সব বড় বড় বিশেষণের কথা আর চিন্তা করিও না। আমরা ঈশ্বরের নিকট কিছুই চাই না বলিয়া তাঁহার গুণাবলী লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। ভগবানের প্রতি প্রেমই আমাদের একমাত্র কাম্য, কিন্তু তখনও সগুণ ঈশ্বরের ভাব আমাদিগকে অনুসরণ করিতে থাকে, আমরা মনুষ্যভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি না, লাফ দিয়া দেহভাবের বাহিরে যাইতে পারি না; সুতরাং আমরা যেভাবে পরস্পরকে ভালবাসি, ঈশ্বরকেও সেইভাবে ভালবাসিব।

মানব-প্রেমের পাঁচটি স্তর আছেঃ

১. অতি সাধারণ এবং নিম্নতম হইল—'শান্ত' প্রেম, তখন আমরা আশ্রয়, আহার ও সর্ববিধ প্রয়োজনের জন্য পিতার উপর নির্ভর করি।

২. দাস্য-প্রেমঃ যে-প্রেম আমাদিগকে সেবার প্রেরণা দেয়। ভৃত্য যেমন প্রভুকে সেবা করে—মানুষ ভগবানকে সেইভাবে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। এই সেবার ভাব অন্যান্য ভাবের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে; তখন প্রভু সৎ কি অসৎ, দয়ালু কি নির্দয়, সে সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হইয়া যাই।
৩. সখ্য-প্রেমঃ বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, সমানে সমানে ভালবাসা, সঙ্গীর প্রতি সঙ্গীর ভালবাসা, খেলার সাথীর প্রতি খেলার সাথীর ভালবাসা। মানুষ তখন ভগবানকে নিজ সহচর বলিয়া অনুভব করে।
৪. বাৎসল্য প্রেমঃ ভগবানকে সন্তানভাবে দেখা। ভারতে এই বাৎসল্য-ভাবটি পূর্বোক্ত সখ্য এবং শান্ত প্রেম হইতে উচ্চতর গণ্য হইয়া থাকে, কারণ ইহাতে ভয়ের বিন্দুমাত্র স্থান নাই।
৫. মধুর প্রেমঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম; ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—ভগবান্ই শ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ।

এই মধুর-ভাবটি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছেঃ চারিচক্ষুর মিলন হওয়ায় দুটি আত্মার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল; প্রেম দুই আত্মার মধ্যবর্তী হইয়া দুইকে এক করিয়া দিল।

যখন কোন ব্যক্তি শেষোক্ত পূর্ণ প্রেমের অধিকারী হয়, তখন তাহার সমস্ত বাসনা চলিয়া যায়। পূজাপদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান গির্জা—কোন কিছুরই সে অপেক্ষা রাখে না। সকল ধর্মের লক্ষ্য—মুক্তির বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু এবং অন্যান্য বন্ধন হইতে মুক্তির ভাবও ত্যাগ করিতে হয়। সেই উচ্চতম প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নাই, কারণ শ্রেষ্ঠ প্রেমে পরিপূর্ণ একত্ববোধ হয়; স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞানে শারীরিক ভেদবুদ্ধি থাকে। সুতরাং মিলন একমাত্র আত্মাতেই সম্ভব। আমাদের দেহবোধ যতই ক্ষীণ হইবে, প্রেম ততই পূর্ণ হইবে; অবশেষে যাবতীয় দেহজ্ঞান দূরীভুত হইয়া দুটি আত্মা এক হইয়া যাইবে। প্রেমকে আমরা চিরদিন ভালবাসি। রূপ অতিক্রম করিয়া প্রেম অরূপকে দর্শন করে। লোকে বলে—'প্রেমিক ইথিওপের ললাটে হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকে।'১ ইথিওপ একটি ইঙ্গিত মাত্র। এই ইঙ্গিতেরই উপর মানুষ স্বীয় প্রেম অর্পণ করে। ভক্তি যখন উত্তেজক পদার্থগুলি পরিত্যাগ

করে, তখন দেখিতে পায়, মধ্যে যে বস্তু রহিয়াছে, উহা উত্তেজক পদার্থগুলিকে সুন্দর মুক্তাতে পরিণত করে; মানুষও তেমনি প্রেমের বিস্তার করে; প্রেমই মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই আদর্শই চিরদিন স্বার্থশূন্য, সুতরাং মানুষ প্রেমকেই ভালবাসে। ভগবান্ প্রেম-স্বরূপ। আমরা ভগবানকে ভালবাসি অর্থাৎ প্রেমকেই ভালবাসি। প্রেম আমরা প্রত্যক্ষ করি মাত্র। প্রেমকে ব্যক্ত করা যায় না। মূক ব্যক্তি মাখন আস্বাদন করিলেও মাখনের গুণাগুণ ব্যক্ত করিতে পারে না। মাখন মাখনই এবং যাহারা মাখন আস্বাদ করে নাই, তাহাদের নিকট ইহার গুণাবলী প্রকাশ করা যায় না। প্রেমের জন্যই প্রেম—যাহারা প্রেম অনুভব করে নাই, তাহাদিগের নিকট ইহা প্রকাশ করা যায় না।

প্রেমকে একটি ত্রিভুজের সহিত তুলনা করা যায়। উহার প্রথম কোণটি হইল—প্রেম কখনও কিছু চায় না, কোন কিছু প্রার্থনা করে না। দ্বিতীয় কোণ— প্রেমের মধ্যে ভয়ের স্থান নাই; তৃতীয় এবং চরম কোণ—প্রেমের জন্যই প্রেম। প্রেমের প্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মতর এবং উন্নততর হয়। জাগতিক সম্পর্কে চরম প্রেম দুর্লভ, কারণ মানবীয় প্রেম প্রায় সর্বদাই পারস্পরিক এবং সাপেক্ষ। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম এক অবিচ্ছিন্ন ধারার মত, উহাকে কোন কিছুই ব্যাহত বা রুদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ যখন ঈশ্বরকে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে ভালবাসে—ভিক্ষুকের মত নয় অথবা কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়, তখন সেই প্রেম চরম ক্রমবিকাশের স্তরে উপনীত হইয়া জগতে এক মহাশক্তিরূপে পরিণত হয়। এই-সকল অবস্থায় পৌঁছিতে দীর্ঘ সময় লাগে। আমাদের স্বভাবগত ভাবের সাহায্যেই আমাদিগকে প্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে। কেহ সেবার ভাব লইয়া জন্মায়, কেহ বা মাতৃ-প্রেম লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ভাবেই হউক, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনে আমাদের নিজ নিজ প্রকৃতির সুযোগ লইতে হইবে।

৫. জগতের কল্যান-সাধন

আমাকে প্রশ্ন করা হয়–তোমাদের ধর্ম, সমাজের কোন্ কাজে লাগে? সমাজকে সত্য-পরীক্ষার কষ্টিপাথর করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। সমাজ আমাদের ক্রমোন্নতির একটি সোপান মাত্র–ইহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। নতুবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গুণাগুণ এবং প্রয়োজনীয়তাও শিশুর প্রয়োজনের মাপকাঠিতে বিচার করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত আসুরিক। সামাজিক অবস্থা চিরস্থায়ী হইলে উহা শিশুর চিরকাল শিশু থাকার অনুরূপ হইবে। শিশু কখনই পূর্ণ মানব হইতে পারিবে না; ব্যবহারের বা অর্থের দিক্ হইতে শব্দগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ, সুতরাং নির্দোষ সমাজও অসম্ভব। মানুষকে শৈশব অবস্থার ভিতর দিয়াই বড় হইতে হইবে। কোন একটি বিশেষ অবস্থায় সমাজ ভাল হইতে পারে, কিন্তু উহাই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না; কারণ সমাজ অবিরত পরিবর্তনশীল প্রবাহ মাত্র। দম্ভ এবং অহমিকাপূর্ণ বর্তমান বণিক্-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এ-সবই 'লর্ড মেয়রের প্রদর্শনী' র মত।

জগৎ ব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তাশক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতে চায়। আমার গুরুদেব বলিতেন–'তুমি তোমার নিজের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত করিতেছ না কেন? অলিকুল আপনা হইতে আসিবে।' জগতে এখন ভগবদ্ভাবে তন্ময় লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাসবান্ হও, তাহা হইলেই ভগবানে বিশ্বাস আসিবে। জগতের ইতিহাস হইল–পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান্ এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস।

আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন–অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। প্রথমে নির্জনে থাকিয়া নিজেকে উপযুক্ত যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। নিজেকে একটি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র করিয়া তুলিতে হইবে। প্রথমে জগতের লোকের জন্য অনুভব কর। যখন সকলেই কাজের জন্য উন্মুখ, তখন হৃদয়বান্ ব্যক্তি কোথায়? কোথায় সেই হৃদয়বত্তা, যাহা ইগনেসিয়াস লয়লাকে সৃষ্টি করিয়াছিল? তোমার বিনয় এবং প্রেম পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাহার ঈর্ষা আছে, সে বিনয়ী বা প্রেমিক হইতে পারে

না। ঈর্ষা এক বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর পাপ। ইহা মানুষের মধ্যে রহস্যজনকভাবে প্রবেশ করে। নিজেকে প্রশ্ন কর—ঈর্ষা এবং হিংসায় তোমার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি? হিংসা ও ঈর্ষার জন্য জগতে বার বার বহু আরব্ধ সৎকার্য বিনষ্ট হইয়াছে। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান্ হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

সৎকর্ম-সাধনের দ্বিতীয় অঙ্গ—ধারণার জন্য মস্তিষ্ক, কিন্তু ইহা শুষ্ক সাহারা-মরুতুল্য, কারণ বুদ্ধি একা কিছুই করিতে সমর্থ হয় না, যদি উহার পশ্চাতে হৃদয়বত্তা না থাকে। প্রেম অবলম্বন কর, প্রেম কোন কালে ব্যর্থ হয় না। প্রেম থাকিলে মস্তিষ্ক ধারণা করিতে পারিবে, হস্ত সৎকর্ম করিতে পারিবে। ঋষিরা ধ্যান-ধারণা করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন। ‘যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ঈশ্বর দর্শন করিবে।’ সকল মহাপুরুষই ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়াছে, এবং অতীন্দ্রিয় একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং আমরা এখন সেই গৌরবোজ্জ্বল চিত্রের পরিকল্পনাটি পূর্ণ করিতে পারি মাত্র।

৬. বাহ্যপূজা

[১০ এপ্রিল, ১৯০০ খ্রীঃ আমেরিকার সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বাইবেল পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহুদি-জাতির সমগ্র ইতিহাস এবং চিন্তাধারার মূলে রহিয়াছেন দুই শ্রেণীর শিক্ষক—পুরোহিত ও ধর্মগুরুগণ। পুরোহিতগণ রক্ষণশীলতার এবং ধর্মগুরুগণ প্রগতিশীলতার প্রতীক। মোট কথা এই সমাজে ক্রমে ক্রমে গোঁড়া আনুষ্ঠানিকতা প্রবেশ করে, বাহ্য আচার সবকিছুকে অধিকার করিয়া বসে। প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। তারপর কয়েকজন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আবির্ভূত হন। তাঁহারা নূতন ভাব ও নূতন আদর্শ প্রচার করেন এবং সমাজকে গতিশীল করিয়া তোলেন। কয়েক পুরুষ যাইতে না যাইতেই শিষ্যগণ নিজ নিজ গুরুর প্রচারিত ভাবসমূহের প্রতি এত বেশী অনুরক্ত হইয়া পড়ে যে, ঐগুলি ছাড়া তাহারা অন্য কিছু দেখিতে পায় না। এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল এবং উদার-মতাবলম্বী প্রচারকগণও কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোঁড়া পুরোহিতে পরিণত হইবেন। আবার প্রগতিবাদী মনীষিগণও—কাহারও মধ্যে সামান্য প্রগতি দেখিলে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা অতিক্রম করিয়া সমাজ অগ্রসর হউক—ইহা তাঁহারা চাহিবেন না। যাহা-কিছু যেভাবে চলিতেছে, ঐভাবে চলিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট।

প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ধর্মের প্রাথমিক নীতিগুলির মধ্যে যে-শক্তি কাজ করে, তাহা ধর্মের বাহ্যরূপে প্রকাশিত হয়। ... নীতি বা গ্রন্থ, কতকগুলি নিয়ম, বিশেষ প্রকারে অঙ্গ-সঞ্চালন, দাঁড়ানো বা বসিয়া পড়া—এ-সবই উপাসনার পর্যায়ভুক্ত। অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে ধারণা করিতে পারে, সে-জন্য পূজা স্থূল রূপ পরিগ্রহ করে। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকই একটি ভাবকে কখনও ভাবরূপে পূজা করে না। ইহা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে যে কোনদিন হইবে, তাহাও মনে হয় না। এই শহরের কয় সহস্র ব্যক্তি ঈশ্বরকে একটি ভাব-রূপে পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত? অতি সামান্যই। মানুষ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বাস করে, তাই ঐরূপ করিতে পারে না। মানুষকে আরও পূর্ব হইতে ধর্মভাব দিতে হইবে। তাহাকে স্থূলভাবে কিছু করিতে বলোঃ কুড়িবার উঠিতে এবং কুড়িবার বসিতে বল, সে উহা বুঝিবে। তাহাকে এক নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে এবং অপর রন্ধ্র দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে বলো–সে উহা বুঝিবে। নিছক ভাবগত আদর্শ মানুষ মোটেই গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা তাহাদের দোষ নয়। ... ঈশ্বরকে ভাব-রূপে পূজা করার শক্তি যদি তোমার থাকে, তবে উত্তম। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন তুমি উহা পারিতে না। ... লোকেরা যদি স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ধর্ম সম্বন্ধে ধারণাগুলি অপরিণত এবং ধর্মের বহিরঙ্গগুলি স্থূল ও অমার্জিত হইয়া পড়ে। লোকেরা যদি মার্জিত ও শিক্ষিত হয়, তাহাদের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি আরও সুন্দর হয়। বাহ্য অনুষ্ঠানাদি থাকিবে, সেগুলি শুধু কালের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হইবে।

ইহা আশ্চর্য যে, মুসলমানধর্ম যেভাবে বাহ্যপূজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম কখনও সেরূপ করে নাই। ... চিত্র, স্থাপত্য বা সঙ্গীত– মুসলমানদের থাকিতে পারিবে না, কেন-না এইগুলি বাহ্যপূজার সহায়ক। জনসাধারণের সঙ্গে পুরোহিতের কখনও যোগাযোগ হইবে না, হইলেই পার্থক্যের সৃষ্টি হইবে। এইভাবে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু তবু পয়গম্বরের দেহত্যাগের পর দুই শতাব্দী যাইতে না যাইতেই সাধু-সন্তের পূজা প্রবর্তিত হইল। এইখানে সাধুর পায়ের অঙ্গুষ্ঠ! ঐখানে তাঁহার গাত্রচর্ম!–এইভাবে চলিতে লাগিল। বাহ্যপূজা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্যতম সোপান এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

সুতরাং বাহ্যপূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করিয়া উহার যেটুকু ভাল, তাহা গ্রহণ করা উচিত, এবং অন্তর্নিহিত ভাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। অবশ্য সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের পূজা বলিতে গাছ-পাথরের পূজাই বুঝায়। প্রত্যেক অমার্জিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিই যে-কোন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া উহাতে নিজস্ব ভাব যোগ করিয়া দিবে, তাহাতেই তাহার সাহায্য হইবে। সে একখণ্ড অস্থি বা পাথর পূজা করিতে পারে। বাহ্যপূজার এই সকল অপরিণত অবস্থায় মানুষ কিন্তু কখনও পাথরকে পাথর হিসাবে বা গাছকে গাছ

হিসাবেই পূজা করে নাই—সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাই তোমরা এটুকু জান। পণ্ডিতেরা অনেক সময় বলেন—মানুষ গাছ-পাথরের পূজা করিত। এ-সবই অর্থহীন। মানবজাতি যে-সকল নিম্নস্তরের পূজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, বৃক্ষ-পূজা ঐগুলির অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে কখনই মানুষ ভাব ছাড়া অন্য কিছুরই পূজা করে নাই। মানুষ ভাবস্বরূপ এবং ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারে না। দেবভাবে পূর্ণ মনুষ্য-মন সূক্ষ্মভাবকে জড়বস্তুরূপে উপাসনা করার মত এত বড় ভুল কখনও করিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে মানুষ পাথর বা গাছকে ভাবরূপেই চিন্তা করিয়াছে। সে কল্পনা করিয়াছে যে, সেই পরম সত্তার কিছুটা এই পাথর বা গাছে রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে আত্মা আছেন। বৃক্ষপূজা এবং সর্পপূজা সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জ্ঞান-বৃক্ষ আছে। বৃক্ষ অবশ্যই থাকিবে এবং সর্পের সহিত ঐ বৃক্ষ কোন-না-কোন ভাবে জড়িত থাকিবে। এগুলি প্রাচীনতম পূজা-পদ্ধতি। সেখানেও দেখিবে, কোন বিশেষ প্রস্তর বা বিশেষ বৃক্ষই পূজিত হইয়াছে—পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষ এবং যাবতীয় প্রস্তরকে পূজা করা হয় নাই।

বাহ্যপূজার উন্নততর সোপানে ঈশ্বরের বা পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তিকে পূজা করা হয়। লোকে মৃত ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি এবং ঈশ্বরের কাল্পনিক প্রতিমা নির্মাণ করে। পরে তাহারা ঐগুলি পূজা করে।

আরও উন্নততর পূজা—মৃত সাধু-সন্ত, সজ্জন বা সতী-সাধ্বীদের পূজা। লোকে তাঁহাদের দেহাবশেষ পূজা করে। তাহারা ঐ দেহাবশেষের মধ্যে সাধু-মহাপুরুষগণের উপস্থিতি অনুভব করে এবং মনে করে যে, তাঁহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঐ সাধু-মহাপুরুষগণের অস্থি স্পর্শ করিলে তাহাদের রোগ সারিবে। দেহাস্থিই যে তাহাদিগকে নিরাময় করিবে তাহা নয়, দেহাস্থির মধ্যে যিনি আছেন, তিনিই তাহাদের রোগ আরোগ্য করিবেন।

এ-সবই নিম্নাঙ্গের পূজা, তথাপি এগুলি পূজা। আমাদিগকে ঐগুলি অতিক্রম করিতে হইবে। বুদ্ধি-বিচারের দিক্ দিয়া দেখিলে শুধু ঐগুলি যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু অন্তরের দিক্ দিয়া আমরা এগুলি ছাড়িতে পারি না। যদি তুমি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে

সাধু-মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তিগুলি সরাইয়া লও এবং তাহাকে কোন মন্দিরে যাইতে না দাও, তাহা হইলে সে মনে মনে ঐগুলি স্মরণ করিবে। সে উহা না করিয়া পারিবে না। একজন অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের বিষয় ভাবিতে গেলেই মেঘের উপর উপবিষ্ট দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট একজন বৃদ্ধ ছাড়া অন্য কাহারও কথা তাঁহার মনে উদিত হয় না। ইহা দ্বারা কি প্রতীত হয়? তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষাই তিনি পান নাই এবং মানবিক ভাব ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করিতে তিনি অক্ষম।

বাহ্য উপাসনার আরও একটি উন্নততর সোপান আছে—প্রতীক-উপাসনা। বাহ্যবস্তু সেখানেও বর্তমান, কিন্তু তাহা বৃক্ষ প্রস্তর বা সাধু-মহাত্মাদের স্মৃতিচিহ্ন নয়। ঐগুলি প্রতীক। পৃথিবীতে সর্বপ্রকার প্রতীকই বর্তমান। বৃত্ত অনন্তের একটি মহৎ প্রতীক। ... ইহার পর সমচতুর্ভুজ; সুপরিচিত ক্রুশপ্রতীক এবং ইংরেজী S ও Z পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে কাটিয়াছে—এরূপ দুইটি আঙুল প্রভৃতি রহিয়াছে।

কেহ কেহ মনে করে, এই প্রতীকগুলির কোন সার্থকতা নাই। ... আবার কেহ কেহ অর্থহীন কোন জাদুমন্ত্র চায়। যদি তুমি উহাদিগকে সহজ সরল সত্য কথা বলো, তবে উহারা গ্রহণ করিবে না। ... মানুষের স্বভাবই এই—তাহারা তোমাকে যত কম বুঝে, ততই তোমাকে ভাল ও বড় মনে করে। প্রত্যেক দেশে সব যুগেই এরূপ উপাসকেরা কতগুলি জ্যামিতিক চিত্র এবং প্রতীক দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। একদা জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। অধিকাংশ লোকই এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, জ্যামিতিবিদ্ একটি সমচতুর্ভুজ অঙ্কিত করিয়া উহার চারি কোণে অর্থহীন জাদুমন্ত্রবিশেষ বলিলেই সমগ্র পৃথিবী ঘুরিতে শুরু করিবে, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং ভগবান্ অবতরণ করিয়া লাফাইতে থাকিবেন ও মানুষের ক্রীতদাস হইয়া পড়িবেন। দলে দলে এইরূপ উন্মাদ দিবারাত্র এ-সকল বিষয় একাগ্রমনে পড়ে। এ-সবই ব্যাধিবিশেষ। ইহাদের চিকিৎসক প্রয়োজন। দার্শনিকদের জন্য এ- সব নয়।

আমি কৌতুক করিতেছি, কিন্তু এজন্য খুবই দুঃখিত। সমস্যাটি ভারতে অত্যন্ত গুরুতর। এইগুলি জাতির ধ্বংস, অবনতি এবং অবৈধ বলপ্রয়োগের লক্ষণ। তেজ, বীর্য,

জীবনীশক্তি, আশা, স্বাস্থ্য এবং যাহা কিছু মঙ্গলকর তাহার লক্ষণই হইল শক্তি। যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন দেহ, মন এবং বাহুতে বল থাকা আবশ্যক। এই-সব অর্থহীন জাদুমন্ত্রবিশেষ দ্বারা অধ্যাত্মশক্তি অর্জনের চেষ্টা বিশেষ ভয়ের কারণ—ইহাতে জীবন-নাশের ভয়ও আছে। 'প্রতীক উপাসনা' বলিতে আমি ঐগুলি বলি নাই। কিন্তু এই প্রতীকোপাসনায় কিছু সত্য নিহিত আছে। কিছু সত্য ব্যতিরেকে কোন মিথ্যাই দাঁড়াইতে পারে না। কোন বস্তুর বাস্তব সত্তা না থাকিলে উহার অনুকরণও হইতে পারে না।

বিভিন্ন ধর্মে প্রতীক-পূজা বর্তমান। এমন সব প্রতীক আছে, যেগুলি সুন্দর, শক্তিপ্রদ, বলিষ্ঠ এবং ছন্দোময়। ভাবিয়া দেখ, লক্ষ লক্ষ লোকের উপর ক্রুশের কি আশ্চর্য প্রভাব! অর্ধচন্দ্ররূপ প্রতীকের কথা ধর। এই একটি প্রতীকের যে কি আকর্ষণী শক্তি, সে-কথা চিন্তা করিয়া দেখ। পৃথিবীতে সর্বত্রই সুন্দর ও চমৎকার প্রতীকসমূহ বর্তমান। এই প্রতীকগুলি ভাব প্রকাশ করে এবং কতকগুলি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। সচরাচর প্রতীকগুলি বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তি স্ফুরণ করে।

প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে ক্যাথলিকদের তুলনা করিয়া দেখ। বিগত চারিশত বৎসরের মধ্যে এই দুইটি সম্প্রদায়ের কোনটি হইতে অধিকসংখ্যক সাধক ও শহীদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্যাথলিকদের ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত আলোক, ধূপধুনা, মোমবাতি, যাজকদের পোষাক প্রভৃতির একটা স্বকীয় প্রভাব রহিয়াছে। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম অতি শুষ্ক ও গদ্যময়। প্রোটেস্টাণ্টরা অনেক বিষয়ে জয়যুক্ত হইয়াছে, কয়েকটি দিকে ক্যাথলিকদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছে, সুতরাং তাহাদের ধারণাগুলি স্পষ্টতর এবং অধিকতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ভিত্তিক। এই পর্যন্ত ঠিক থাকিলেও তাহারা অনেক কিছু হারাইয়াছে। ... গির্জার মধ্যে চিত্রগুলির কথাই ধরা যাক। এগুলি কবিত্ব-শক্তিকে ভাষা দিবার একটি প্রচেষ্টা, কবিতার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে কেন আমরা উহা গ্রহণ করিব না? অন্তরাত্মা যাহা চাহিতেছে, তাহা অন্তরাত্মাকে দিব না কেন? আমাদিগকে সঙ্গীতও গ্রহণ করিতে হইবে। প্রেসবিটেরিয়ানরা আবার সঙ্গীতেরও বিরোধী, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে উহারা যেন মুসলমান। সমস্ত কবিতা ধ্বংস হউক! সমস্ত অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হউক!

তারপর তাহারা যে সঙ্গীত সৃষ্টি করে, সে সঙ্গীত ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমি দেখিয়াছি, কিরূপে তাহারা বক্তৃতামঞ্চের উপর আলোকের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে।

বহির্জগতে রূপায়িত কবিতায় ও ধর্মে অন্তঃকরণ পূর্ণ হউক। কেন না হইবে? বাহ্য উপাসনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পার না—বার বার ইহা সমাজে জয় লাভ করিবে। ... ক্যাথলিকরা যাহা করে, তাহা যদি তোমার রুচিসম্মত না হয়, তবে ইহা অপেক্ষা আরও ভাল কিছু কর। কিন্তু আমরা আরও ভাল কিছু করিতেও পারিব না, অথচ যে কবিত্ব পূর্ব হইতে বিদ্যমান, তাহাও গ্রহণ করিব না—এটি এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। জীবনে কবিত্ব থাকা একান্ত আবশ্যক। তুমি পৃথিবীতে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পার, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহা শুষ্ক অস্থি নয়, ইহা সমস্ত বস্তুর সার। যাহা নিত্য সত্তা, তাহা দ্বৈতভাবাপন্ন যে-কোন বস্তু অপেক্ষা অধিকতর কবিত্বপূর্ণ।

পাণ্ডিত্যের স্থান নাই। অধিকাংশের পক্ষেই পাণ্ডিত্য সাধন-পথে একটি বাধা। ... একজন পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থাগারের যাবতীয় পুস্তক পড়িয়াও মোটেই ধার্মিক না হইতে পারে, আর একজন হয়তো নিরক্ষর হইয়াও ধর্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ। নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত। আমি যখন 'মনুষ্যত্ব-লাভের বা মানুষ-গড়ার ধর্ম'—এই শব্দ-কয়টি ব্যবহার করি, তখন আমি ঐগুলি দ্বারা কোন পুস্তক, অনুশাসন বা মতবাদের কথা বুঝি না। যে-ব্যক্তি সেই অনন্ত সত্তার এতটুকুও তাহার অন্তরে অনুভব করিয়াছে বা ধারণা করিয়াছে, আমি তাহার কথাই বলি।

আমি সারা জীবন যাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি, যাঁহার কয়েকটিমাত্র ভাব শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি, তিনি কোনক্রমে তাঁহার নিজের নাম লিখিতে পারিতেন। আমি সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু সারা জীবনে আমি তাঁহার মত আর একজনকেও দেখিলাম না। তাঁহার সম্বন্ধে ভাবিলে নিজেকে নির্বোধ বলিয়া মনে হয়, কেন-না আমি বই পড়িতে চাই, অথচ তিনি কোনদিনই বই পড়েন নাই। অন্যের উচ্ছিষ্ট তিনি কখনও গ্রহণ করিতে চাহিতেন না অর্থাৎ অন্যের চিন্তাধারাকে কোনদিন তিনি নকল

করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই কারণে তিনি নিজেই নিজের বই ছিলেন। সারা জীবন জ্যাক (Jack) কি বলিল, জন (John) কি বলিয়াছে—তাহাই বলিয়া আসিতেছি; নিজে কিছুই বলিলাম না। জন পঁচিশ বৎসর পূর্বে এবং জ্যাক পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছে, তাহা জানিয়া তোমার কী লাভ হইয়াছে? তোমার নিজের কি বলিবার আছে, তাই বলো।

মনে রাখিও—পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য নাই। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলেরই ধারণা ভুল। মনকে বলিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার মধ্যেই জ্ঞানের একমাত্র মূল্য। আমি অবাক্ হইতেছি যে অনন্ত কাল ধরিয়া এই গলাধঃকরণের দ্বারা আমাদের বদহজম হইতেছে না কেন? আমাদের এইখানেই থাকিয়া যাবতীয় পুস্তক পুড়াইয়া ফেলা প্রয়োজন এবং নিজেদের অন্তরে চিন্তা করা কর্তব্য। তোমরা অনেক বিষয়ে কথা বলো এবং তোমাদের ‘ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য’কে হারাইবার আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া ওঠ। এই অন্তহীন গলাধঃকরণের দ্বারা প্রতি মুহূর্তেই তোমরা ব্যক্তিত্ব হারাইতেছ। আমি যাহা শিক্ষা দিতেছি, তাহা যদি তোমাদের মধ্যে কেহ শুধু বিশ্বাস করে, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব; তোমাদের মধ্যে যদি স্বাধীন চিন্তাশক্তি উদ্দীপিত করিতে পারি, তবেই আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। ... আমার উদ্দেশ্য—নরনারীকে বলা, মেষগুলিকে নয়। ‘নরনারী’ বলিতে আমি ‘মানুষ’ বুঝি। তোমরা ক্ষুদ্র মানুষ নও যে, পথের নোংরা ন্যাকড়া টানিয়া আনিয়া খেলার পুতুল তৈরি করিবে।

এই জগৎ একটি শিক্ষার স্থান! মানুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ ব্ল্যাঙ্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সে সবই জানে! কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক কিছুই বলেন নাই! খুশীমত কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিলে আমি অধ্যাপককে বলিতাম, ‘বাহিরে যাও! তোমার কোন প্রয়োজন নাই!’ এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধকে যে-কোন উপায়ে মনে রাখিবে! তোমার চিন্তা যদি ভুল হয় হউক, তুমি সত্য লাভ করিলে কি না করিলে তাহাতে কিছু আসে যায় না। মূল কথাটি হইল—মনকে নিয়ন্ত্রিত করা। যে-সত্য তুমি অপরের নিকট হইতে লইয়া গলাধঃকরণ করিবে, তাহা তোমার নিজস্ব হইবে না। আমার মুখে সত্য শুনিয়া তাহা শিক্ষা দিতে পার না এবং আমার মুখে শুনিয়াও কোন সত্য তুমি শিখিতে পার না। কেহ কাহাকেও শিখাইতে

পারে না। সত্য অনুভব করিয়া নিজ প্রকৃতি অনুয়ায়ী তাহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। ... নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া, নিজেদের চিন্তা করিয়া, নিজেদের আত্মা উপলব্ধি করিয়া, সকলকেই শক্তিমান্ হইতে হইবে। কারাগারে আবদ্ধ সৈনিকদের মত একসঙ্গে উঠা, একসঙ্গে বসা, একই খাদ্য খাওয়া, একসঙ্গে মাথা নাড়িয়া অন্যের প্রচারিত মতবাদ গলাধঃকরণ করা প্রভৃতিতে কোন ফল নাই। বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ। সমতাই (একই রকম চিন্তা করা) মৃত্যুর লক্ষণ।

একবার একটি ভারতীয় শহরে অবস্থানকালে এক বৃদ্ধ আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'স্বামীজী, আমার পথ নির্দেশ করুন।' আমি দেখিলাম যে, লোকটি আমার সম্মুখের টেবিলটির মত একেবারে জড় হইয়া গিয়াছে; মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইয়াছিল। আমি বলিলাম, 'তোমাকে যাহা নির্দেশ দিব, তাহা পালন করিবে কি? তুমি কি চুরি করিতে পার? তুমি মদ খাইতে পার? মাংস খাইতে পার? লোকটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'এ আপনি আমাকে কী শিক্ষা দিতেছেন?' আমি তাহাকে বলিলাম, 'এই দেওয়ালটি কি কখনও চুরি করিয়াছে? এ কি কখনও মদ খাইয়াছে?' লোকটি উত্তর দিল, 'না, মহাশয়।' মানুষই চুরি করে, মদ খায়, আবার ঈশ্বরত্ব লাভ করে।

'বন্ধু, আমি জানি, তুমি একটি দেওয়াল মাত্র নও। কিছু একটা কর! কিছু একটা কর!' আমি অনুভব করিয়াছিলাম, লোকটি চুরি করিলে তাহার আত্মা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে। তোমাদের যে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহা কিরূপে বুঝিব?—তোমরা তো এক সঙ্গে ওঠ, একসঙ্গে বস এবং একই কথা বল। ইহা মৃত্যুর পথ জানিবে। তোমার আত্মার জন্য কিছু কর। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অন্যায় কর, কিন্তু একটা কিছু কর! আমাকে তোমরা এখন বুঝিতে না পারিলেও ক্রমে বুঝিতে পারিবে। আত্মা যেন বার্ধক্যগ্রস্ত হইয়াছে, উহার উপর মরিচা ধরিয়াছে। এই মরিচা ঘষিয়া মাজিয়া ছাড়াইতে হইবে, তবেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব। জগতে এত অন্যায় কেন, তাহা তোমরা এখন বুঝিতেছ। এই মরিচা হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্যই গৃহে ফিরিয়া এ-বিষয়ে চিন্তা কর।

আমরা জাগতিক বস্তুসকলের জন্য প্রার্থনা করি। কোন উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত আমরা ব্যবসায়ী বুদ্ধি লইয়া ভগবানের পূজা করি। খাওয়া-পরার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। পূজা উত্তম। কিছু না করা অপেক্ষা কিছু একটা করা ভাল। 'নাই মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল।' অত্যন্ত ধনী এক যুবক রোগাক্রান্ত হইল, অমনি সে আরোগ্যলাভের জন্য গরীবদের দান করিতে আরম্ভ করিল। ইহা ভাল কাজ, কিন্তু ইহা ধর্ম নয়—আধ্যাত্মিকতা নয়, ইহা জাগতিক ব্যাপার। কোন্‌টা জাগতিক এবং কোন্‌টা জাগতিক নয়? যখন উদ্দেশ্য ইহজীবন, এবং ভগবান্ সেই উদ্দেশ্য-লাভের উপায়রূপে ব্যবহৃত হন, তখন তাহা জাগতিক। আবার যেখানে ঈশ্বর-লাভই উদ্দেশ্য এবং জাগতিক জীবন সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানেই অধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ। সুতরাং যে-ব্যক্তি এই জাগতিক জীবনে প্রাচুর্য কামনা করে, তাহার নিকট এই জীবনের স্থায়িত্ব তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সে পরলোকগত ব্যক্তিদের দেখিতে চায় এবং তাহাদের সহিত আবার সুখে দিন কাটাইতে চায়।

যে-সকল মহিলা প্রেতাত্মাদের সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মিডিয়াম বা মাধ্যম। দেখিতে দীর্ঘাকার, তবু তিনি মাধ্যম। বেশ! এই মহিলা আমাকে খুবই পছন্দ করিতেন এবং তাহার নিকট যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রেতাত্মারা সকলেই আমার প্রতি বিনম্র ছিল। আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। বুঝিতেই পারিতেছ, ইহা ছিল মধ্যরাত্রে প্রেতশক্তি-বাদীদের বৈঠক। মাধ্যম বলিল, ' … আমি একজন প্রেতকে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতেছি। প্রেত আমাকে বলিতেছে যে, ঐ বেঞ্চের উপর একজন হিন্দু ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।' আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, 'তোমাকে এই কথা বলিবার জন্য কোন প্রেতাত্মার সাহায্য প্রয়োজন হয় না।'

সেখানে একজন সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ এবং বিবাহিত যুবক উপস্থিত ছিল। সে তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। মাধ্যম বলিল, 'অমুকের মা এখানে আসিয়াছেন।' যুবকটি তাহার মায়ের বিষয় আমাকে বলিতেছিল—তাহার মা মৃত্যুকালে খুবই ক্ষীণদেহ হইয়া পড়েন। কিন্তু পর্দার অন্তরাল হইতে যে-মা বাহির হইল! তোমরা যদি তাহাকে

দেখিতে! যুবকটি কি করে, তাহা দেখিতে চাহিলাম। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, যুবকটি লাফাইয়া সেই প্রেতাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'মাগো, তুমি প্রেতলোকে গিয়া অপরূপ হইয়াছ!' আমি বলিলাম, 'আমি ধন্য যে আমি এইখানে উপস্থিত আছি। এই-সব ঘটনা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে।'

বাহ্য উপাসনার প্রসঙ্গে আবার বলি, ইহজীবন এবং জাগতিক সুখের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঈশ্বরকে উপাসনা করা অতি নিম্নস্তরের পূজা। ... অধিকাংশ লোকই দেহের এই মাংসপিণ্ড এবং ইন্দ্রিয়ের সুখ অপেক্ষা উচ্চতর কোন চিন্তা করিতে পারে না। এই বেচারারা এই জীবনেই যে-সুখের সন্ধান করে, সে-সুখ পাশব সুখ ... । তাহারা প্রাণিখাদক। তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের ভালবাসে। ইহাই কি মানুষের সব গৌরব? আমরা আবার সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে পূজা করি। কি জন্য? কেবল এই-সব জাগতিক বস্তু পাইবার জন্য এবং সর্বদা ঐগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য। ... ইহার অর্থ এই যে, আমরা এখনও পশুপক্ষীর জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই। পশু-পক্ষী অপেক্ষা আমরা মোটেই উন্নততর নই। আমরা উন্নততর কিছু জানিও না। আমাদিগকে ধিক্! আমাদের আরও উচ্চতর শিক্ষা পাওয়া উচিত। পশুপক্ষীদের সহিত আমাদের তফাত এই যে, আমাদের মত তাহাদের ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। ... পশুদের মত আমাদেরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি আরও তীক্ষ্ণ। একটি কুকুর যেরূপ তৃপ্তি সহকারে একখণ্ড হাড় চিবায়, আমরা একগ্রাস অন্ন তেমন তৃপ্তির সহিত খাই না। আমাদের অপেক্ষা তাহাদের জীবনে আনন্দ বেশী। সুতরাং আমরা পশুদের চেয়ে একটু নিকৃষ্ট।

তোমরা কেন এমন কিছু হইতে চাহিবে যাহাতে প্রকৃতির কোন শক্তি তোমাদের উপর অধিকতর কার্যকরী হইবে? ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিন্তনীয় বিষয়। কি তোমাদের কাম্য—এই জীবন, ইন্দ্রিয়সুখ, এই শরীর অথবা অনন্তগুণে মহৎ এবং উচ্চতর কোন কিছু বস্তু, এমন একটি অবস্থা যাহার কোন চ্যুতি নাই. যেখানে কোন পরিবর্তন নাই?

অতএব ইহা দ্বারা কি প্রতীত হয়? তোমরা বল, 'হে প্রভু, অন্ন দাও, অর্থ দাও, আমার রোগ নিরাময় কর, ইহা কর, তাহা কর!' যখনই তোমরা এইরূপ প্রার্থনা কর, তখনই

'আমি জড়বস্তু, জড়জগৎই আমার লক্ষ্য'—এই ভাবে নিজেদের সম্মোহিত করিয়া থাক। প্রত্যেকবারই যখন তোমরা জাগতিক অভিলাষ পূরণের জন্য উদ্যোগী হও, ততবারই তোমরা বলিতে থাক—'আমরা জড়দেহ মাত্র, আমরা আত্মা নই।' ...

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এইগুলি সব স্বপ্ন মাত্র। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এইগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সৃষ্টিতে মৃত্যু—সেই মহান্ মৃত্যু আছে, যাহা সব ভ্রান্তি, সব স্বপ্ন, এই দেহবাদিতা, এই মর্মবেদনার অবসান ঘটাইয়া দেয়। কোন স্বপ্নই চিরস্থায়ী হইতে পারে না—শীঘ্র অথবা বিলম্বে ইহা অবশ্যই শেষ হইবে। স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করিতে পারে, এমন কেহ নাই। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবুও বলিব, এই প্রকারের উপাসনার সার্থকতা আছে। এভাবে চলিতে থাকো। প্রার্থনা একেবারে না করা অপেক্ষা কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করা ভাল। এই সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এগুলি প্রাথমিক শিক্ষা। মন ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়, দেহ, এই জাগতিক ভোগসুখের ঊর্ধ্বে কোন বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

মানুষ কিরূপে ইহা করে? প্রথমে মানুষ চিন্তাশীল হয়। তুমি যখন কোন একটি সমস্যা চিন্তা করিতে থাক, তখন সেখানে চিন্তারই এক অপূর্ব আনন্দ আসে, ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ বলিয়া কিছু থাকে না। ... এই আনন্দই মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে লইয়া যায়। ... একটি মহৎ ভাবের বিষয় চিন্তা কর। ... চিন্তা যতই গাঢ় হইবে এবং মন সংযত হইবে, তখন তোমার দেহের বিষয় আর মনে উদিত হইবে না। তোমার ইন্দ্রিয়গুলির কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন তুমি সমস্ত দেহ-জ্ঞানের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইবে। তখন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছিল, সবই ঐ একটি ভাবে কেন্দ্রীভূত হইবে। ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি পশু অপেক্ষা উন্নত। সেই সময় দেহাতীত এমন একটি অনুভূতি, এমন একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তুমি লাভ করিবে, যাহা কেহই তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ... মনের লক্ষ্য সেখানে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নয়।

এইরূপে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া তুমি অন্য অনুভূতির রাজ্যে একটু করিয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তখন এই জগৎ বলিয়া তোমার নিকট আর কিছুই

থাকিবে না। যখন তুমি সেই আত্মার একটু আভাস পাইবে, তখন তোমার ইন্দ্রিয়বোধ, তোমার ভোগাকাঙ্ক্ষা, তোমার দেহাসক্তি চলিয়া যাইবে। সেই ভাররাজ্যের আভাস একের পর এক তোমার নিকট উদ্ঘাটিত হইবে। তোমার যোগ সম্পূর্ণ হইবে এবং আত্মা তোমার নিকট আত্মারূপেই প্রতিভাত হইবে। তখনই তুমি ঈশ্বরকে আত্মারূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিবে। তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, উপাসনা কোন স্বার্থসাধনের নিমিত্ত নয় | অন্তরের অন্তরে এই পূজা ছিল ভালবাসা, যাহা অসীম হইয়াও সসীম; ঈশ্বরের পাদপদ্মে ইহা অন্তরের চিরন্তন আত্মনিবেদন—সর্বস্ব অর্পণ। সেখানে কেবল 'তুমি', 'আমি' নই। 'আমি' সেখানে মৃত—'তুমি'ই সেখানে আছ, 'আমি' নাই। সেখানে আমি ধন, সৌন্দর্য, এমন কি পাণ্ডিত্যও কামনা করি না। আমি মুক্তি চাই না। যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে বিশ হাজার বার নরক গমন করিব। আমি কেবল একটি বস্তু কামনা করিঃ হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রেমাস্পদ হও।

৭. উপাসক ও উপাস্য

[১৯০০ খ্রীঃ ৯ এপ্রিল আমেরিকায় সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত। সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা আইডা আনসেল যেখানে স্বামীজীর বক্তৃতার কোন কথা বুঝিতে পারেন নাই, সেখানে ... চিহ্ন দেওয়া আছে। ( ) বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ অনুলেখিকা কর্তৃক স্বামীজীর বাক্যের পরিপূরক হিসাবে বসান হইয়াছে।]

মানব-প্রকৃতির যে দিক্‌টি অধিকতর বিশ্লেষণাত্মক, আমরা উহার আলোচনা করিতেছিলাম।২এখন আমরা আবেগ-প্রধান দিক্‌টি দেখিব। ... পূর্বেরটি মানুষকে গ্রহণ করে একটি সীমাহীন সত্তারূপে—নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব হিসাবে; অপরটিতে মানুষ একটি সীমাবদ্ধ জীব; ... কয়েক ফোঁটা চোখের জল বা কয়েকটি দীর্ঘশ্বাসের জন্য প্রথমটির অপেক্ষা করিবার সময় নাই; দ্বিতীয়টি কিন্তু ঐ অশ্রুবিন্দু না মুছিয়া দিয়া, ঐ বেদনার ক্ষত আরোগ্য না করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। প্রথমটি বৃহৎ—এত বৃহৎ ও চমৎকার যে, সময়ে সময়ে ঐ বিস্তার আমাদিগকে স্তম্ভিত করে। অপরটি অতি সাধারণ, কিন্তু তবুও বড় সুন্দর এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহী। প্রথমটি আমাদিগকে এত উঁচুতে লইয়া যায় যে, আমাদের ফুসফুস যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। সেই বায়ুমণ্ডলে আমরা নিঃশ্বাস লইতে পারি না। অপরটি যেখানে আমরা আছি, আমাদিগকে সেইখানেই রাখিয়া দেয় এবং জীবনের নানা বিষয়ে (সীমায়িতভাবে) দেখিবার চেষ্টা করে। একটি কোন কিছুই গ্রহণ করিবে না, যতক্ষণ না উহাতে বুদ্ধির দেদীপ্যমান ছাপ দেওয়া হইতেছে; অন্যটি দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বাসের উপর; যাহা সে দেখিতে পায় না, তাহা সে মানিয়া লয়। দুইটিরই প্রয়োজন আছে। পাখি কখনও একটি মাত্র ডানায় উড়িতে পারে না।

আমরা এমন মানুষ দেখিতে চাই, যিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছেন ... উদারহৃদয়, উন্নতমনা (কর্মে নিপুণ)। প্রয়োজন এইরূপ ব্যক্তির, যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের দুঃখ-কষ্ট তীব্রভাবে অনুভব করে। ... আর (আমরা চাই) এমন মানুষ, যিনি শুধু অনুভব করিতে পারেন তাহা নয়, পরন্তু বস্তুনিচয়ের অর্থ ধরিতে পারেন, যিনি প্রকৃতি

এবং বুদ্ধির মর্মস্থলে গভীরভাবে ডুব দেন। (আমাদের দরকার) এমন মানুষের, যিনি সেখানেও থামেন না, (কিন্তু) যিনি (সেই অনুভবকে বাস্তব কর্মে) রূপায়িত করতে ইচ্ছুক। মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং হাত—এই তিনটির এই প্রকার সমন্বয় আমাদের কাম্য। জগতে অনেক লোক-শিক্ষক আছেন, কিন্তু দেখিতে পাইবে—(তাঁহাদের অধিকাংশই) একদেশী। কাহারও দৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির প্রখর মধ্যাহ্নসূর্যের উপর, অন্য কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে না। অপর কেহ বা শুনেন প্রেমের সুমধুর গীতি এবং ইহা ছাড়া আর কিছুতে কান দিতে পারেন না। আবার আর একজন আছেন কাজে (ডুবিয়া), তাঁহার অনুভূতি বা চিন্তার সময় নাই। এরূপ একজন মহামানব কেন (চাও) না—যিনি যেমন কর্মী, তেমনি জ্ঞানী, আবার সমানভাবে প্রেমিক? ইহা কি সম্ভব?—নিশ্চয়ই নয়। ভবিষ্যতের মানুষ হইবেন এই প্রকৃতির। বর্তমানকালে (কেবল মাত্র) অল্প কয়েকজনই এইরূপ আছেন। (ইঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে) যতদিন না সারা পৃথিবী এই ধরনের মানুষে পূর্ণ হয়।

আমি তোমাদিগকে এতদিন মেধা (এবং) বিচারের সম্বন্ধে বলিয়াছি। সমগ্র বেদান্ত আমরা শুনিলামঃ মায়ার যবনিকা টুটিয়া যায়, ঘন মেঘ সরিয়া গিয়া সূর্যালোক আমাদের উপর দীপ্তি পায়। এ যেন হিমালয়ের উত্তুঙ্গদেশ অধিরোহণের চেষ্টা, মেঘের রাজ্যের ওপারে অদৃশ্য যে শৃঙ্গগুলি রহিয়াছে—সেখানে পৌঁছিতে হইবে। এখন আমরা অন্য দিক্‌টি পর্যবেক্ষণ করিতে চাই—অতি সুরম্য উপত্যকাগুলি—প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য! (আমরা আলোচনা করিব) ভালবাসা—যাহা সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা সত্ত্বেও আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, সেই প্রেম—যাহার জন্য আমরা দুঃখের শিকল গড়িয়াছি, যাহার জন্য মানুষ অনন্তকাল স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে আত্মবলিদান এবং সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করিয়া চলিয়াছে উহার কষ্ট। সেই অনন্ত অনুরাগ, যাহার জন্য মানুষ নিজের হাতে বন্ধন পরে, দুর্গতি ভোগ করে—তাহাই এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। অপরটি আমরা যে ভুলিয়া যাইব, তাহা নয়। হিমালয়ের হিমবাহ কাশ্মীরের ধান্যক্ষেত্রের সহিত মিতালি করুক। বজ্রের গুরুগর্জনের সহিত মিশিয়া যাক পাখির কাকলি।

যাহা কিছু অতি পরিপাটি ও মনোহর, তাহা লইয়াই আমাদের বর্তমান আলোচনা। পূজাপ্রবৃত্তি তো সর্বত্রই আছে, প্রত্যেক জীবে। প্রত্যেকেই ভগবানের আরাধনা করে। যে নামই দেওয়া যাক না কেন, তিনি সকলের পূজা পাইতেছেন। পৃথিবীর কর্দমে—যেমন সুন্দর পদ্মফুলের, যেমন জীবনের আরম্ভ, উপাসনার আদিও সেইরূপ। … (প্রথমে) খানিকটা ভয়ের ভাব থাকে, পার্থিব লাভের দিকে আকাঙ্ক্ষা থাকে। ভিখারীর পূজা। এগুলি পূজাবৃত্তির প্রারম্ভিক। (উহার অবসান) ঈশ্বরকে ভালবাসিয়া এবং মানুষের মধ্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া।

ভগবান্ আছেন কি? এমন একজন কেহ আছেন কি, যাঁহাকে ভালবাসা যায়, যিনি ভালবাসা গ্রহণ করিতে সমর্থ? পাথরকে ভালবাসিয়া বেশী কিছু লাভ নাই। আমরা তাহাই ভালবাসি, যাহা ভালবাসা বুঝতে পারে, যাহা আমাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে। উপাসনার বেলাও এইরূপ। আমাদের এই পৃথিবীতে কেহ একখণ্ড শিলাকে (শিলা বলিয়া) পূজা করিয়াছে, এমন কথা কখনও বলিও না। সে সর্বদাই উপাসনা করিয়াছে (পাথরটির মধ্যে সর্বব্যাপী সত্তাকে)।

আমাদের ভিতর সেই বিশ্বপুরুষ রহিয়াছেন, আমরা সন্ধান পাই। (কিন্তু) তিনি যদি আমাদের হইতে পৃথক্ না হন, তাহা হইলে আমরা উপাসনা করিব কিভাবে? আমি তো শুধু 'তোমাকে' পূজা করিতে পারি, 'আমাকে' নয়। কেবল 'তোমারই' নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, 'আমার' কাছে নয়। 'তুমি' বলিয়া কেহ আছে কি?

একই বহু হন। আমরা যখন এককে দেখি, তখন মায়ার মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত সঙ্কীর্ণ যাহা কিছু সব অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু বহুত্ব যে অর্থহীন নয়, ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক। বহুকে অবলম্বন করিয়াই আমরা একে পৌঁছাই। …

ব্যক্তি-ঈশ্বর কেহ আছেন কি—যে-ঈশ্বর চিন্তা করেন, বুঝিতে পারেন, আমাদিগকে চালিত করেন?—আছেন। নির্বিশেষ ঈশ্বরের এই-সব গুণের কোনটিই থাকিতে পারে না। তোমরা প্রতেক্যেই এক-একটি ' ব্যক্তি'। তুমি চিন্তা কর, ভালবাসো, ঘৃণা কর; (তুমি) ক্রুদ্ধ বা

দুঃখিত হও ইত্যাদি; কিন্তু তবুও তুমি হইতেছ নৈর্ব্যক্তিক, সীমাহীন। একাধারে (তুমি) সগুণ এবং নির্গুণ। ব্যক্তি এবং ব্যক্তিহীন-দুটি দিক্ই তোমার রহিয়াছে। ঐ (নৈর্ব্যক্তিক সত্তা) ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে না, (কিংবা) দুঃখিত (বা) ক্লিষ্ট হইতে পারে না, এমন কি দুঃখকষ্টের চিন্তাও করিতে পারে না। নৈর্ব্যক্তিক সত্তা চিন্তা করিতে পারে না, জানিতে পারে না। উহা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। পক্ষান্তরে ব্যক্তিসত্তার জ্ঞান আছে, চিন্তা, মৃত্যু প্রভৃতি আছে। যিনি সর্বগত পরম, স্বভাবতই তাঁহার দুইটি দিক্ থাকিতে বাধ্য। একটি বস্তুসমূহের অনন্ত সত্তার (নির্ণায়ক), অপরটি তাঁহার ব্যক্তিভাব–আমাদের সকলের আত্মার আত্মা। তিনি সকল প্রভুর প্রভু। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারই নির্দেশে ইহা বর্তমান রহিয়াছে। ...

সেই অনন্ত–চিরশুদ্ধ, চির (মুক্ত) ... তিনি কিন্তু বিচারক নন। ভগবান্ কখনও (একজন) বিচারপতি হইতে পারেন না। তিনি সিংহাসনের উপর বসিয়া ভাল এবং মন্দের বিচার করেন না। ... তিনি শাসক নন, সেনাপতি নন, (কিংবা) অধিনায়কও নন। অসীম করুণাময়, অনন্ত প্রেমময় তিনি–সগুণ (ঈশ্বর)।

অপর একটি দিক্ হইতে দেখ। তোমার দেহের প্রতি জীবকোষে (cell) একটি আত্মা রহিয়াছে, যাহা জীবকোষটি সম্বন্ধে সচেতন। উহা একটি পৃথক্ বস্তু। উহার নিজস্ব একটি ইচ্ছা আছে, স্বকীয় একটি ছোট কর্মক্ষেত্র আছে। সমস্ত (জীবকোষ) মিলিয়া গোটা ব্যক্তিটি গঠিত। (অনুরূপভাবে) বিশ্বজগতের যিনি সগুণ ঈশ্বর, তিনি হইলেন এই-সব (বহু ব্যক্তির) সমষ্টি।

আর একদিক্ দিয়া বিচার কর। তুমি–অর্থাৎ আমি যেমন তোমায় দেখি–হইলে তোমার পরম সত্তার যেটুকু আমার দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ হইয়া অনুভূত, সেইটুকু। আমার চোখ এবং ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়া তোমাকে দেখিব বলিয়া তোমাকে আমি খণ্ডিত করিয়া লইয়াছি। তোমার যেটুকু আমার চোখের দ্বারা দেখা সম্ভব, ততটুকুই আমি দেখি। আমার মন তোমার যতটা ধারণা করিতে পারে, ততটুকুই আমি 'তুমি' বলিয়া জানি, তাহার বেশী নয়। এইভাবেই আমি সর্বগত নৈর্ব্যক্তিককে অনুশীলন করিতে গিয়া (তাঁহাকে সগুণরূপে দেখি), যতক্ষণ

আমাদের দেহ আছে, মন আছে, ততক্ষণ আমরা সর্বদা এই ত্রি-সত্তাকে দেখি—ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং আত্মা। এই তিন সর্বদাই এক অবিভাজ্য সত্তায় থাকিতে বাধ্য ... প্রকৃতি রহিয়াছে, মানবাত্মাসমূহ রহিয়াছে; আবার রহিয়াছেন তিনি—যাঁহাতে প্রকৃতি এবং মানবাত্মাসমূহ (অবস্থিত)।

বিশ্বাত্মা শরীর ধারণ করিয়াছেন। আমার আত্মা হইল ঈশ্বরের একটি অংশ। ঈশ্বর আমাদের চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা। ইহাই সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাযোগ্য উচ্চতম আদর্শ।

তুমি যদি দ্বৈতবাদী না হইয়া একত্ববাদী হও, তাহা হইলেও তোমার ব্যক্তি-ঈশ্বর থাকিতে পারে। ... এক অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। সেই এক নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন। সেই কারণে এক হইতে তিনি সৃষ্টি করিলেন (বহু)। ... বৃহৎ 'আমি'-কে—সত্য 'আমি'-কে পূজা করিতেছে ক্ষুদ্র 'আমি'। অতএব সব মতেই 'ব্যক্তি' (ঈশ্বর) রাখা চলে।

কেহ কেহ এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে, তাহারা অন্যান্য অপেক্ষা সুখী হয়। ন্যায়পরায়ণ কাহারও রাজত্বে এইরূপ কেন হইবে? পৃথিবীতে মৃত্যু রহিয়াছে কেন? এই-সকল কঠিন প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে। (এই সমস্যাসমূহের) কখনও সমাধান হয় নাই। কোন দ্বৈতভূমি হইতে উহাদের মীমাংসা হইতে পারে না। বস্তুসমূহ যথার্থই যেভাবে আছে, ঠিক সেভাবেই ঐগুলি দেখিবার জন্য আমাদিগকে দার্শনিক বিচারে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা আমাদের নিজেদের কর্ম হইতেই কষ্ট ভোগ করিতেছি। এজন্য ঈশ্বর দায়ী নন। আমরা যাহা করি, তাহা আমাদেরই দোষ, অন্য কাহারও নয়। ঈশ্বরকে দোষারোপ কেন? ...

অমঙ্গল কেন রহিয়াছে? যে একটিমাত্র উপায়ে (এই সমস্যার) মীমাংসা করিতে পার, তাহা হইল—(এই কথা বলা যে, ঈশ্বর) ভাল ও মন্দ দুই-এরই কারণ। সগুণ ঈশ্বরবাদের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা এইঃ যদি বল ভগবান্ শুধু সৎ—তিনি অসৎ নন, তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার নিজের যুক্তির ফাঁদে আটকাইয়া পড়িবে। কি করিয়া জানিলে—(একজন)

ভগবান্ আছেন? বলা হয় (যে, তিনি) এই বিশ্বজগতের পিতা; আরও বলা হয়—তিনি মঙ্গলময়। কিন্তু পৃথিবীতে অমঙ্গলও তো রহিয়াছে, তবে তিনি অমঙ্গলস্বরূপই বা হইবেন না কেন? ... সেই সমস্যা।

ভাল বলিয়া কিছু নাই, মন্দও নাই। আছেন শুধু ভগবান্। ... ভাল কি, তাহা তুমি কিরূপে জান? তুমি নিজে (উহা) অনুভব কর। (মন্দ কি, তাহারও জ্ঞান কি ভাবে হয়?) যদি মন্দ আসে, তুমি উহা অনুভব কর। ... ভাল এবং মন্দ আমাদেরই অনুভব দ্বারা আমরা জানিয়া থাকি। এমন কেহ নাই যে, শুধু ভালই অনুভব করে—তাহার অনুভূতি শুধু সুখকর। এমন কেহও নাই, যে শুধু অপ্রীতিকর ভাবগুলিই অনুভব করে। ...

অভাব এবং উদ্বেগই সকল দুঃখের কারণ, সুখেরও। অভাব কি বাড়িয়া চলিতেছে, না কমিতেছে? জীবন কি সহজ না জটিল হইতেছে? নিশ্চয়ই জটিল। অভাবসমূহ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে। যাঁহারা তোমাদের প্রপিতামহ ছিলেন, তাঁহাদের তোমাদের মত এত পোষাক বা অর্থের দরকার ছিল না। তাঁহাদের বৈদ্যুতিক গাড়ী ছিল না, রেলরাস্তাও তাঁহারা দেখেন নাই। আর এইজন্যই তাঁহাদের পরিশ্রম করিতে হইত কম। যখন এই-সব জিনিষের প্রয়োজন হয়, সঙ্গে সঙ্গে অভাবও আসে, খাটুনিও বাড়ে। আকাঙ্ক্ষা যত বাড়ে, প্রতিযোগিতাও ততই বাড়ে।

অর্থসংগ্রহ খুবই শ্রমসাধ্য। অর্থ রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ। কিছু বিত্তসঞ্চয়ের জন্য তোমাদিগকে সারা পৃথিবীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, (আর) উহা রক্ষা করিতে সমস্ত জীবন ধরিয়া চলিবে সংগ্রাম। (অতএব) গরীবের চেয়ে ধনীর দুশ্চিন্তা বেশী। ... এই তো ব্যাপার!—

জগতের সর্বত্রই ভাল ও মন্দ রহিয়াছে| কখনও কখনও মন্দের মধ্য দিয়া ভাল আসে সত্য, কিন্তু অন্য সময়েও আবার মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কোন-না-কোন সময়ে অমঙ্গল সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তি মদ্যপান আরম্ভ করুক। (প্রথমে) কিছু খারাপ হয় না, কিন্তু সে যদি ক্রমাগত মদ্যপান করিতে থাকে, তবে তাহার অনিষ্ট হইবে।

... কেহ ধনী পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিল; বেশ ভাল। কিন্তু সে বুদ্ধিহীন হইল, কখনও তাহার শরীর বা মস্তিস্ক খাটাইল না। ইহা শুভ হইতে অশুভের উৎপত্তি। আবার জীবনের প্রতি আমাদের যে নিবিড় ভালবাসা, সেই কথা চিন্তা কর। আমরা কতই না ছুটাছুটি—লাফালাফি করি! কয়েক মুহূর্তের তো জীবন! কত কঠোর পরিশ্রম করি! একেবারে অসমর্থ শিশু হইয়া আমরা জন্মিয়াছি। জিনিষগুলি বুঝিয়া উঠিতে আমাদের বহু বৎসর কাটিয়া যায়। অবশেষে ষাট বা সত্তর বৎসরে আমাদের চোখ খোলে এবং তখন আদেশ আসে— 'বেরিয়ে যাও!' এই তো অবস্থা!

আমরা দেখিলাম—ভাল ও মন্দ আপেক্ষিক শব্দ। যাহা আমার কাছে ভাল, তাহা তোমার পক্ষে মন্দ। আমার যাহা নৈশ আহার, তুমি যদি তাহা খাও তো কাঁদিতে আরম্ভ করিবে, আর আমি হাসিয়া উঠিব। ... আমরা দুজনে (হয়তো) নাচিতেছি, কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে—আর তুমি যাতনার সহিত। ... একই বস্তু আমাদের জীবনের কোন এক সময়ে শুভ, অন্য সময়ে অশুভ। কি করিয়া বলিতে পার, ভাল ও মন্দ সবই পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকে এবং এটি সর্বৈব ভাল আর ঐটি সর্বৈব মন্দ?

এখন প্রশ্ন এই, ভগবান্ যদি চিরদিন সৎই হন, তাহা হইলে এই-সব অশুভের জন্য দায়ী কে? খ্রীষ্টান এবং মুসলমানগণ বলেন, শয়তান বলিয়া একজন ভদ্রলোক আছেন। কিন্তু কি করিয়া বল—দুইজন ভদ্রলোক কাজ করিতেছেন? একজনেরই থাকা চাই; যে-আগুনে শিশু পুড়িয়া যায়, তাহাতে খাবারও তৈরী হয়। কি করিয়া বলিবে, আগুন ভাল বা মন্দ? কি করিয়া বলিবে, উহা দুই ব্যক্তির সৃষ্টি? (তথাকথিত) সমস্ত অশুভ তবে কে সৃষ্টি করিল? অন্য কোন সমাধান নাই। তিনি পাঠাইতেছেন মৃত্যু ও জীবন, মড়ক ও মহামারী এবং সবকিছু। ঈশ্বর যদি এইরূপ হন, তাহা হইলে তিনিই শুভ, তিনিই অশুভ; তিনিই সুন্দর, তিনিই ভীষণ; তিনিই জীবন এবং তিনিই মৃত্যু।

এইরূপ ঈশ্বরকে কি করিয়া উপাসনা করা যাইবে? আমরা ক্রমশঃ (বুঝিতে) পারিব, মানুষ ভীষণের পূজা কীভাবে শিখিতে পারে; তখনই মানুষ শান্তি পাইবে। মনের শান্তি যদি নষ্ট হইয়া থাকে, দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি যদি না পাইয়া থাক তো সর্বপ্রথম

কর্তব্য—ঘুরিয়া দাঁড়ানো এবং ভীষণের সম্মুখীন হওয়া। উহার মুখোস ছিঁড়িয়া ফেলো, দেখিতে পাইবে—সেই একই (ঈশ্বর) রহিয়াছেন। তিনিই সগুণ ঈশ্বর—যাহা কিছু ভাল (প্রতীয়মান) এবং যাহা কিছু মন্দ (আপাতপ্রতীতিতে)। আর কেহ নাই। দুই জন প্রভু যদি থাকিতেন, তাহা হইলে প্রকৃতি এক মুহূর্তও টিকিয়া থাকিতে পারিত না। প্রকৃতিতে অপর কেহ নাই | সবই একতান। ঈশ্বরের লীলা একদিকে, আর শয়তানের অপরদিকে—এরূপ হইলে সমগ্র সৃষ্টির ভিতর একটি চরম (বিশৃঙ্খলা) উপস্থিত হইত। নিয়ম ভাঙিবার সাধ্য কাহার আছে? এই গ্লাসটি যদি আমি ভাঙিয়া ফেলি, ইহা পড়িয়া যাইবে। একটি পরমাণুকে যদি কেহ স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হয়, অপর প্রত্যেকটি পরমাণুর স্থিতিবৈষম্য ঘটিবে। ... নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করা যায় না। প্রত্যেকটি পরমাণু নিজ স্থানে রহিয়াছে। প্রত্যেকটির ওজন করিয়া, মাপ করিয়া বসান আছে এবং নিজ নিজ (উদ্দেশ্য) পূর্ণ করিতেছে। ঈশ্বরের বিধানে বাতাস বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে। তাঁহার শাসনে জগৎসমূহ যথাযথ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহারই আদেশে মৃত্যু পৃথিবীতে শিকারসন্ধানে রত। একবার ভাবিয়া দেখ তো দুই বা তিন জন ঈশ্বর জগতে মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছেন। ইহা হইতেই পারে না।

আমরা এখন দেখিতে পাইলাম—আমাদের জগৎস্রষ্টা সগুণ ঈশ্বর থাকিতে পারেন, তিনি দয়াময় এবং নিষ্ঠুরও। ... তিনি মঙ্গল, তিনিই অমঙ্গল। তাঁহার স্মিত হাস্য দেখিতে পাই, আবার ভ্রূকুটিও দেখিতে পাই। আর তাঁহার বিধান অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি হইলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা।

সৃষ্টির অর্থ কি? শূন্য হইতে কি কোন কিছুর আবির্ভাব হইতে পারে? ছয় হাজার বৎসর আগে ঈশ্বর স্বপ্নোত্থিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন (এবং) তাহার পূর্বে কিছুই ছিল না—ইহা কী? ঈশ্বর তখন কী করিতেছিলেন? তিনি কি আরামে ঘুমাইতেছিলেন? ভগবান্ হইলেন জগৎ-কারণ, আর কার্য দেখিয়া আমরা কারণকে জানিতে পারি। কার্য যদি না থাকে, তাহা হইলে কারণ কারণই নয়। কারণ সর্বদা কার্যের মধ্য দিয়াই পরিজ্ঞাত। ... সৃষ্টি অনন্ত। ... কাল বা দেশের মাধ্যমে সৃষ্টির আদি চিন্তা করা যায় না।

কেন তিনি এই সৃষ্টি করেন? কারণ তিনি ইহা পছন্দ করেন—কারণ তিনি মুক্ত। ... তুমি আমি নিয়মের অধীন, কেন-না আমরা (শুধু) কতিপয় নির্দিষ্ট পথেই কাজ করিতে পারি, অন্য পথে নয়। 'হাত না থাকিলেও তিনি সবকিছু ধরিতে পারেন, পদবিহীন হইয়াও দ্রুত চলিয়া যান'।৩ দেহ নাই, তথাপি তিনি সর্বব্যাপী।

'চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু চক্ষু যাঁহা দ্বারা দেখে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।৪ তোমরা অন্য কিছুর উপাসনা করিতে পার না। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া আছেন। যাহাকে বলা হয় 'নিয়ম', উহা তাঁহার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। নিয়মসমূহ দ্বারা তিনি জগৎ পরিচালনা করিতেছেন।

এ পর্যন্ত (আমরা আলোচনা করিয়াছি) ঈশ্বর ও প্রকৃতি—শাশ্বত ঈশ্বর, চিরন্তন প্রকৃতি। কোন আত্মারই (কখনও) সৃষ্টি হয় নাই। আত্মার বিনাশও নাই। কেহই তাহার নিজের মৃত্যু কল্পনা করিতে পারে না। আত্মা অসীম, নিত্য বর্তমান। উহা মরিবে কিরূপে? উহা শরীর পরিবর্তন করে। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া দিয়া নূতন অব্যবহৃত পোষাক পরিধান করে, ঠিক সেইরূপ শীর্ণ শরীর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটি নূতন দেহ গ্রহণ করা হয়।৫

আত্মার স্বরূপ কি? আত্মা সর্বশক্তিধর সর্বব্যাপী। চৈতন্যের দৈর্ঘ্যও নাই বা প্রস্থ কিংবা ঘনত্বও নাই। ... উহা এখানে বা সেখানে—ইহা কি করিয়া বলা যায়? এই শরীরটি নষ্ট হইলে (আত্মা) অপর একটি দেহের (মাধ্যমে) কাজ করিবে। আত্মা যেন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু উহার কেন্দ্র হইল দেহে। ঈশ্বর এমন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই বটে, কিন্তু কেন্দ্র সর্বত্র। আত্মা স্বভাবতই আনন্দময়, শুদ্ধ, পূর্ণ; উহার প্রকৃতি যদি অশুচি হইত, তাহা হইলে উহা কখনও শুদ্ধ হইতে পারিত না। ... আত্মার স্বরূপই হইল নিষ্কলুষ; এই জন্যই তো মানুষের পক্ষে পবিত্র হওয়া সম্ভব। আত্মা (স্বভাবতই) আনন্দঘন; তাই বলিয়াই তো উহা আনন্দ লাভ করিতে পারে। আত্মা শান্তিস্বরূপ; (এই কারণেই উহার পক্ষে শান্তি অনুভব করা সম্ভবপর)। ...

আমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের এই দেহবুদ্ধির স্তরে দেখিতেছি, তাহাদের সকলকেই ঈর্ষা, কলহ ও কষ্টের সহিত জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, আর তারপর আসে মৃত্যু। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আমাদের যাহা হওয়া উচিত, আমরা তাহা নই। আমরা স্বাধীন নই, সম্পূর্ণ শুদ্ধ নই, ইত্যাদি। আত্মা যেন অবনত হইয়াছেন; অতএব আত্মার প্রয়োজন—বিস্তার। ...

কিভাবে ইহা করা যায়? উহা নিজে নিজেই সিদ্ধ করিতে পারিবে কি?—না। কোন ব্যক্তির মুখ যদি ধূলিধূসরিত হইয়া থাকে, উহা কি ধূলি দিয়া পরিষ্কার করা চলে? মাটিতে একটি বীজ পুঁতিলাম, উহা হইতে গাছ হইল, গাছ হইতে আবার বীজ, বীজ হইতে অন্য একটি গাছ—এইরূপ চলিতে থাকিবে। মুরগী হইতে ডিম, আবার ডিম হইতে মুরগী। যদি কিছু ভাল কাজ কর, উহার ফল তোমাকে পাইতে হইবে—পুনরায় জন্মগ্রহণ ও দুঃখভোগ। এই অন্তহীন শৃঙ্খলে যদি একবার আটকাইয়া যাও, আর থামিতে পারিবে না। ঘুরিতেই থাকিবে, ... উপরে এবং নীচে, ঊর্ধ্বলোক এবং অধোলোকের (দিকে) এবং এই-সব (দেহসমূহ)। নিষ্কৃতির পথ নাই।

তবে এই-সকল হইতে ত্রাণের উপায় কি এবং এখানে কিই বা তোমার চাই? একটি ভাব হইল—দুঃখ হইতে অব্যাহতি। আমরা প্রত্যেকেই দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছি। ... কর্মের দ্বারা ইহা হইবার নয়। কর্ম কর্মই বাড়ায়। যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি নিজে মুক্ত এবং আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তবে ইহা সম্ভবপর। প্রাচীন ঋষির ঘোষণা—'হে মর্ত্যলোকবাসী ও ঊর্ধ্বলোকনিবাসী অমৃতের সন্তানগণ তোমরা সকলে শোন— আমি রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। যিনি সকল অন্ধকারের পারে, আমি তাঁহাকে জানিয়াছি। এই সংসার-মহাসমুদ্র আমরা পার হই কেবল তাঁহারই কৃপায়।' ৬

ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা এইরূপঃ স্বর্গ আছে, নরক আছে, মর্ত্যলোক আছে; কিন্তু এইগুলি চিরন্তন নয়। যদি আমার নরকে গতি হয়, উহা নিত্যকালের জন্য নয়। যেখানেই থাকি না কেন, একই যন্ত্রণা চলিতে থাকিবে। সমস্যা হইল—এই-সব যন্ত্রণা

অতিক্রম করা যায় কিরূপে? যদি আমি স্বর্গে যাই, হয়তো কিছু বিশ্রাম মিলিবে। কিন্তু হয়তো কোন অপকর্ম করিয়া বসিলাম, তখন তো শাস্তি পাইতে হইবে, স্বর্গবাস চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ... ভারতীয় আদর্শ স্বর্গে যাওয়া নয়। এই পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ কর। নরকেও পড়িও না, স্বর্গকেও তুচ্ছ কর। লক্ষ্য কি?—মুক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই মুক্ত হইতে হইবে। আত্মার মহিমা আবৃত হইয়া আছে। উহাকে পুনরায় অনাবৃত করিতে হইবে। আত্মা তো আছেনই—সর্বত্রই আছেন। কোথায় যাইবেন? ... কোথায়ই বা যাইতে পারেন? যদি এমন কোন স্থান থাকিত, যেখানে আত্মা নাই, তবেই তো সেখানে যাইবার কথা উঠিত। ইনি সদা-বর্তমান—(এইটি) যদি হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে চিরকালের জন্য পরিপূর্ণ সুখ (আসিবে)। আর জন্ম মৃত্যু নয়। ... আর রোগ নয়, দেহ নয়। দেহ (টি) নিজেই তো কঠিনতম ব্যাধি। ...

আত্মা আত্মা (-রূপে) দাঁড়াইয়া থাকিবেন। চৈতন্য চৈতন্যরূপে জীবিত থাকিবেন। ইহা কিভাবে সম্পাদন করা যাইবে? যিনি স্বভাবতই নিত্যবর্তমান, শুদ্ধ ও পূর্ণ, আত্মার (মধ্যে সেই পরমেশ্বরকে) আরাধনা করিয়া। এই জগতে সর্বশক্তিমান্ দুইজন থাকিতে পারেন না। (কল্পনা কর) দুই বা তিনজন ঈশ্বর (আছেন); একজন সংসার সৃষ্টি করিবেন, অপর জন বলিবেন, 'আমি সংসার ধ্বংস করিব।' ইহা কখনও ঘটিতে (পারে না)। ভগবান্ একজনই হওয়া চাই। আত্মা যখন পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান্ (ও) সর্বজ্ঞ (হইয়া যান)। ইনিই উপাসক। উপাস্য কে?—সেই পরমেশ্বর স্বয়ং, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি। আর সর্বোপরি তিনি প্রেম-স্বরূপ। (আত্মা) কিরূপে এই পূর্ণতা লাভ করিবে?—উপাসনা দ্বারা।

৮. দিব্য প্রেম

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে ১০ এপ্রিল ১৯০০ খ্রীঃ প্রদত্ত]

(প্রেমকে একটি ত্রিকোণের প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রথম কোণটি এই যে,) প্রেম কোন প্রশ্ন করে না। ইহা ভিক্ষুক নয়। ... ভিখারীর ভালবাসা ভালবাসাই নয়। প্রেমের প্রথম লক্ষণ হইতেছে ইহা কিছুই চায় না, (বরং ইহা) সবই বিলাইয়া দেয়। ইহাই হইল প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনা, ভালবাসার মাধ্যমে উপাসনা! ঈশ্বর করুণাময় কিনা, এই প্রশ্ন আর উঠে না। তিনি ঈশ্বর, তিনি আমার প্রেমাস্পদ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কিনা, তিনি সান্ত কিংবা অনন্ত, এ-সব আর জিজ্ঞাস্য নয়। যদি তিনি মঙ্গল বিতরণ করেন ভালই, যদি অমঙ্গল করেন, তাহাতেই বা কি আসে যায়? কেবল ঐ একটি—অনন্ত প্রেম ছাড়া তাঁহার অন্যান্য সবগুণই তিরোহিত হয়।

ভারতবর্ষে একজন প্রাচীন সম্রাট্ ছিলেন। তিনি একবার শিকারে বাহির হইয়া বনের মধ্যে জনৈক বড় যোগীর সাক্ষাৎ পান। সাধুর উপর তিনি এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিয়া কিছু উপহার লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। (প্রথমে) সাধু রাজী হন নাই, (কিন্তু) বারংবার সম্রাটের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যাইতে স্বীকার করিলেন। তিনি (প্রাসাদে) উপস্থিত হইলে সম্রাট্কে জানানো হইল। সম্রাট্ বলিলেন, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আমার প্রার্থনা শেষ করিয়া লই।' সম্রাট্ প্রার্থনা করিতেছিলেন, 'প্রভু, আমাকে আরও ধন দাও– আরও (জমি-জায়গা, স্বাস্থ্য), আরও সন্তান-সন্ততি।' সাধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, 'কই, আপনি আমার উপহার তো গ্রহণ করিলেন না?' যোগী উত্তর দিলেন, 'আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেই অধিক ভূসম্পত্তি, টাকাকড়ি, আরও কত কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, আপনি আর আমাকে কি দিবেন? আগে নিজের অভাবগুলি মিটাইয়া নিন।'

প্রেম কখনও যাচ্ঞা করে না, ইহা সব সময় দিয়াই যায়। ... যখন একটি যুবক তাহার প্রিয়তমাকে দেখিতে যায়, ... তাহাদের মধ্যে বেচাকেনার সম্বন্ধ থাকে না; তাহাদের সম্বন্ধ হইতেছে প্রেমের, আর প্রেম ভিক্ষুক নয়। (এইরূপে) আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনার অর্থ ভিক্ষা নয়। যখন আমরা সমস্ত চাওয়া—'প্রভু, আমাকে এটা দাও, ওটা দাও'—শেষ করিয়াছি তখনই ধর্মজীবন আরম্ভ হইবে।

দ্বিতীয়টি (ত্রিকোণ-স্বরূপ প্রেমের দ্বিতীয় কোণ) এই,—প্রেমে ভয় নাই। তুমি আমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে পার, তবু আমি তোমাকে ভালবাসিতেই (থাকিব)। মনে কর, তোমাদের মধ্যে একজন মা—শরীর খুব দুর্বল—দেখিলে, রাস্তায় একটি বাঘ তোমার শিশুটিকে ছিনাইয়া লইতেছে। বল তো, তুমি তখন কোথায় থাকিবে? জানি, তুমি ঐ ব্যাঘ্রটির সম্মুখীন হইবে। অন্য সময়ে পথে একটি কুকুর পড়িলেই তোমাকে পলাইতে হয়, কিন্তু এখন তুমি বাঘের মুখে ঝাঁপ দিয়া তোমার শিশুটিকে কাড়িয়া লইবে। ভালবাসা ভয় মানে না। ইহা সমস্ত মন্দকে জয় করে। ঈশ্বরকে ভয় করা ধর্মের সূত্রপাত মাত্র, উহার পর্যবসান হইল প্রেমে। সমস্ত ভয় যেন তখন মরিয়া গিয়াছে।

তৃতীয়টি (ত্রিকোণাত্মক প্রেমের তৃতীয় কোণ) এই—প্রেম নিজেই নিজের লক্ষ্য। ইহা কখনই অপর কোন কিছুর 'উপায়' হইতে পারে না। যে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি এই-সব পাইবার জন্য', সে ভালবাসে না। প্রেম কখনই কোন উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় নয়; ইহা নিশ্চিতভাবে পূর্ণতম সিদ্ধি। প্রেমের সীমা এবং আদর্শ কি? ঈশ্বরে পরম অনুরাগ—ইহাই সব। কেন মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে? এই 'কেন'র, কোন উত্তর নাই, কেন-না ভালবাসা তো কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নয়। ভালবাসা আসিলে উহাই মুক্তি, উহাই পূর্ণতা, উহাই স্বর্গ। আর কি চাই? অন্য আর কি প্রাপ্তব্য থাকিতে পারে? প্রেম অপেক্ষা মহত্তর আর কি তুমি পাইতে পার?

আমরা সকলে প্রেম অর্থে যাহা বুঝি, আমি তার কথা বলিতেছি না। একটুখানি ভাবপ্রবণ ভালবাসা দেখিতে বেশ সুন্দর। পুরুষ নারীকে ভালবাসিল, আর নারী পুরুষের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখাও তো যায় যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে জন (John) জেনকে

(Jane) পদাঘাত করিল এবং জেনও জনকে লাথি মারিতে ছাড়িল না। ইহা বৈষয়িক ভাব, ভালবাসাই নয়। যদি জন বাস্তবিকই জেনকে ভালবাসিত, তবে সেই মুহূর্তেই সে পূর্ণ হইয়া যাইত। (তাহার প্রকৃত) স্বরূপই প্রেম; সে স্বয়ংপূর্ণ। জন কেবলমাত্র জেনকে ভালবাসিয়া যোগের সমুদয় শক্তি পাইতে পারে, (যদিও) সে হয়তো ধর্মের, মনস্তত্ত্বের বা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মতবাদসমূহের একটি অক্ষরও জানে না। আমি বিশ্বাস করি, যদি কোন পুরুষ ও নারী পরস্পরকে যথার্থ ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে যোগিগণ যে-সকল বিভুতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, এই দম্পতিও সেই-সকল শক্তি (অর্জন করিতে সমর্থ হইবে,) যেহেতু প্রেম যে স্বয়ং ঈশ্বর। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান্ সর্বত্র বিরাজমান এবং (সেইজন্য) তোমাদেরও মধ্যে এই ভালবাসা রহিয়াছে, তোমরা জান বা না জান।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একটি যুবককে একটি তরুণীর জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম। ... মনে করিলাম, যুবককে পরীক্ষা করিবার ইহা একটি উপযুক্ত অবসর। সে তাহার প্রেমের গভীরতার মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয় দর্শন ও দূর-শ্রবণের ক্ষমতা লাভ করে। ষাট কি সত্তর বার যুবকটি একবারও ভুল করে নাই, এবং তরুণী ছিল দুইশত মাইল দূরে। (সে বলিত) ‘এইভাবে তরুণী সাজগোজ করিয়াছে।’ (কিংবা) ‘ঐ সে চলিয়া যাইতেছে।’ আমি ইহা নিজের চোখে দেখিয়াছি।

ইহাই হইতেছে প্রশ্নঃ তোমার স্বামী কি ঈশ্বর নন? তোমার সন্তান কি ঈশ্বর নয়? তুমি যদি তোমার পত্নীকে ঠিক ঠিক ভালবাসিতে পার, জগতের সকল ধর্মের ভাবই তোমাতে ফুটিয়া উঠিবে। তোমার মধ্যেই তুমি লাভ করিবে ধর্মের ও যোগের সমস্ত রহস্য। কিন্তু ভালবাসিতে পার কি? প্রশ্ন তো ইহাই। তুমি বল, ‘মেরী, আমি তোমায় ভালবাসি ... অহো, আমি তোমার জন্য মরিতে পারি।’ (কিন্তু যদি তুমি) দেখ, মেরী অপর এক ব্যক্তিকে চুম্বন করিতেছে, তুমি তাহার গলা কাটিতে চাহিবে। আবার মেরী যদি জনকে অন্য একটি মেয়ের সহিত কথা বলিতে দেখে, তবে সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না এবং জনের জীবন নরকের ন্যায় দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে। ইহার নাম ‘ভালবাসা’ নয়। ইহা যৌন

ক্রয়-বিক্রয়। ইহাকে 'প্রেম' বলা অতীব নিন্দনীয়। সংসারের মানুষ দিবা-রাত্র ঈশ্বর ও ধর্মের কথা বলিয়া থাকে—তেমনি প্রেমের কথাও। প্রত্যেক বিষয়কে একটি ভণ্ডামিতে পরিণত করা—ইহাই তো তোমরা করিতেছ! সকলেই প্রেমের কথা বলে, (তবু) সংবাদপত্রের স্তম্ভে (আমরা পড়ি), প্রত্যেক দিন বিবাহ-বিচ্ছেদের কাহিনী। যখন তুমি জনকে ভালবাস, তখন কি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাস, অথবা তোমার জন্য? (যদি তুমি তোমার নিজের জন্য তাহাকে ভালবাস), তাহা হইলে জনের নিকট হইতে কিছু আশা কর। (যদি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাস), তবে জনের কাছ হইতে তুমি কিছুরই প্রত্যাশা রাখ না। সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী যাহা খুশী করিতে পারে, (এবং) তুমি তাহাকে একইভাবে ভালবাসিবে।

এই তিনটি বিন্দু, তিনটি কোণ লইয়া (প্রেম)-ত্রিভুজ। প্রেম ব্যতীত দর্শনশাস্ত্র শুষ্ক হাড়ের মত, মনস্তত্ত্ব একপ্রকার মতবাদ-বিশেষ এবং কর্ম শুধুই পণ্ডশ্রম। (প্রেম থাকিলে) দর্শন হইয়া যায় কবিতা, মনোবিজ্ঞান হয় (মরমী অনুভূতি) আর কর্ম সৃষ্টির মাঝে মধুরতম বলিয়া পরিগণিত হয়। (কেবলমাত্র) গ্রন্থ-অধ্যয়নে (লোকে) শুষ্ক হইয়া যায়। কে বিদ্বান্?—যে অন্ততঃ একবিন্দু প্রেমও অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বরই প্রেম এবং প্রেমই ঈশ্বর। আর ঈশ্বর তো সব স্থানেই রহিয়াছেন। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ এবং সর্বত্র বিরাজমান—এইটি যে অনুভব করে, সে বুঝিতে পারে না যে, সে মাথায় ভর করিয়া বা পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেমন যে-লোক এক বোতল মদ খাইয়াছে, সে জানে না যে—সে কোথায় রহিয়াছে। ...যদি আমরা দশ মিনিট ভগবানের জন্য কাঁদি, পরবর্তী দুই মাস আমরা কোথায় আছি—সে জ্ঞান আমাদের থাকিবে না। ... আহারের সময়ও আমরা মনে রাখিতে পারিব না, কি খাইতেছি—তাহাও জানিব না। ঈশ্বরকেও ভালবাসিবে, আবার সর্বদা বেশ ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিবে—ইহা (কি করিয়া) সম্ভবপর? ... প্রেমের সেই সর্বজয়ী সর্বব্যাপী শক্তি কিরূপে আসিতে পারে? ...

মানুষ বিচারশীল নয়। তাহারা সকলেই পাগল। শিশুরা (পাগল) খেলায়, তরুণ তরুণীকে লইয়া, বৃদ্ধেরা তাহাদের অতীতের চর্বিত-চর্বণে।৭ কেহ বা পাগল অর্থের পিছনে। কেহ

কেহ তবে ঈশ্বরের কন্য পাগল হইবে না কেন? জন (John) জেনের (Jane) জন্য যেরূপ পাগল হইয়া ছুটিতেছে, ঈশ্বরের প্রেমের জন্য সেইরূপ উন্মাদ হও। কোথায়, এমন লোক কোথায়? (অনেকে) বলে, ' অমি কি এইটি ছাড়িব? অমুকটা ত্যাগ করিব? একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'বিবাহ কি করিব না?' না, কোন বিষয়ই ছাড়িতে যাইও না। বিষয়ই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে। অপেক্ষা কর, তুমি সব কিছুই ভুলিবে।

(সম্পূর্ণরূপে) ভগবৎপ্রেমে পরিণত হওয়া–এখানেই প্রকৃত উপাসনা। রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে সময় সময় ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়; সেই-সব অত্যাশ্চর্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ অলৌকিক ভগবৎপ্রেমে কিরূপ আত্মহারা হইয়া বেড়াইতেছেন! এইরূপ প্রেমই লাভ করিতে হইবে। ঐশ্বরিক প্রেম এই প্রকার হওয়াই উচিত–কিছুই না চাহিয়া, কিছুই অন্বেষণ না করিয়া।

প্রশ্ন হইয়াছিল–কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে? তোমর সমস্ত বিষয়-সম্পদ, তোমার সকল পরিজন, সন্তান-সন্ততি–সবকিছু অপেক্ষা প্রিয়তর ভাবিয়া ঈশ্বরকে উপাসনা কর। (তাঁহাকে উপাসনা কর) যেন তুমি স্বয়ং ভালবাসাকেই ভালবাসিতেছ। এমন একজন আছেন, যাঁহার নাম 'অনন্ত প্রেম'–ইহাই ঈশ্বরের একমাত্র সংজ্ঞা। যদি এই ... বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুমাত্র ভাবিও না। যতক্ষণ অনন্তপ্রেমস্বরূপ তিনি রহিয়াছেন, ততক্ষণ আমাদের ভাবনা কিসের? উপাসনার অর্থ কি, (তোমরা) দেখিলে তো? অন্য সব চিন্তা অবশ্যই চলিয়া যায়। ঈশ্বর ছাড়া সমস্তই তিরোহিত হয়। সন্তানের প্রতি পিতা বা মাতার যে ভালবাসা, স্বামীর উপর স্ত্রীর যে প্রেম, পত্নীর প্রতি স্বামীর যে ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে আকর্ষণ–এই-সব প্রেম একত্র ঘনীভূত করিয়া ঈশ্বরকে দিতে হইবে। যদি কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসে, তবে সে অন্য-পুরুষকে ভালবাসিতে পারে না। যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোন (নারীকে) ভালবাসা সম্ভব নয়। ইহাই হইল ভালবাসার ধর্ম।

আমার গুরুদেব বলিতেন, 'মনে কর এই ঘরের মধ্যে এক থলে মোহর রহিয়াছে, আর পাশের ঘরে একটি চোর আছে–সে ঐ মোহরের থলের কথা জানে। চোরটি কি ঘুমাইতে

পারিবে? নিশ্চয়ই নয়। সব সময়েই সে পাগল হইয়া ভাবিতে থাকিবে, কি উপায়ে মোহরগুলি আত্মসাৎ করা যায়।' ... (এইরূপে) কোন লোক যদি ভগবানকে ভালবাসে, তবে সে কি করিয়া অন্য কিছুকে ভালবাসিবে? ঈশ্বরের বিপুল প্রেমের সম্মুখে অন্য কিছু দাঁড়াইবে কিরূপে? উহার কাছে সবকিছুই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সেই প্রেমকে লাভ করিবার জন্য—বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য, উহা অনুভব করিয়া উহাতেই অবস্থান করিবার জন্য পাগল হইয়া ছুটাছুটি না করিয়া মন থামিতে পারে কি?

আমরা এইভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসিবঃ ' আমি ধন চাই না, (বন্ধুবান্ধব বা সৌন্দর্য চাই না) বিষয়-সম্পত্তি, বিদ্যা, এমন কি মুক্তিও চাই না। যদি ইহাই তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে সহস্র মৃত্যুর কবলে পাঠাইয়া দাও। আমার শুধু এই প্রার্থনা যে, আমি যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি, আর যেন কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ের প্রতি যে টান, সেরূপ তীব্র ভালবাসা যেন আমার হৃদয়ে আসে, কিন্তু কেবল সেই চিরসুন্দরের জন্য। ঈশ্বরকে বন্দনা! প্রেমময় ঈশ্বরকে বন্দনা!' ঈশ্বর ইহা ছাড়া অন্য কিছু নন। অনেক যোগী যে-সব অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতে পারেন, তিনি সেগুলি গ্রাহ্য করেন না। ক্ষুদ্র জাদুকরেরা ক্ষুদ্র কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ জাদুকর; তিনি সমুদয় জাদুবিদ্যা দেখাইতে পারেন। কে জানে কত ব্রহ্মাণ্ড (আছে,) কে ভ্রূক্ষেপ করে? ...

আর একটি উপায় আছে। সবকিছু জয় করিতে, সমস্ত কিছু দমন করিতে—শরীর (এবং) মন উভয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে। ... কিন্তু (ভক্ত বলেন) 'সবকিছু জয় করিবার সার্থকতা কি? আমার কাজ ঈশ্বরকে লইয়া।'

একজন যোগী ছিলেন, খুব ভক্ত! গলক্ষত-রোগে তিনি যখন মুমূর্ষু তখন অপর একজন যোগী—দার্শনিক—তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। (শেষোক্ত) যোগী বলিলেন, 'দেখুন, আপনি আপনার ক্ষতের উপর মন একাগ্র করিয়া উহা সারাইয়া ফেলুন না কেন?' তৃতীয় বার যখন এইরূপ বলা হইল, তখন (সেই পরমযোগী) উত্তর দিলেন, 'তুমি কি ইহা সম্ভব মনে কর, যে-মন সম্পূর্ণরূপে আমি ভগবানকে নিবেদন করিয়াছি, (তাহা এই হাড়মাসের

খাঁচায় টানিয়া আনিব)?' যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার সাহায্যের জন্য দেবসেনাদলকে আহ্বান করিতে সম্মত হন নাই। 'এই ক্ষুদ্র শরীর কি এতই মূল্যবান্ যে ইহাকে দুই বা তিন দিন বেশী বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আমি বিশ হাজার দেবদূতকে ডাকিয়া আনিব?'

(জাগতিক দিক্ হইতে) এই শরীরই আমার সর্বস্ব। ইহাই আমার জগৎ, আমার ভগবান্। আমি শরীর। দেহে চিমটি কাটিলে আমি মনে করি, আমাকেই কাটিলে। যদি মাথা ধরিল তো মুহূর্তে আমি ভগবানকে ভুলিয়া যাই। আমি দেহের সহিত এমনই জড়িত! ঈশ্বর এবং সব কিছুকেই নামাইয়া আনিতে হইবে, আমার সর্বোচ্চ লক্ষ্য—এই দেহের জন্য। এই দৃষ্টিকোণ হইতে যীশুখ্রীষ্ট যখন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মরণ বরণ করিলেন এবং (তাঁহার সাহায্যের জন্য) দেবদূতগণকে ডাকিলেন না, তখন তিনি মূর্খের কাজই করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে নামাইয়া আনিয়া ক্রুশ হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু যিনি প্রেমিক, তাঁহার নিকট এই দেহ কিছুই নয়; তাঁহার দিক্ হইতে দেখিলে—কে এই অকিঞ্চিৎকর জিনিষের জন্য মাথা ঘামাইবে? এই শরীর থাকে কি যায়—বৃথা চিন্তায় কি লাভ? রোম্যান সৈন্যগণের ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডের চেয়ে এর দাম বেশী নয়।

(জাগতিক দৃষ্টি) ও প্রেমিকের দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল তফাত। ভালবাসিয়া যাও। যদি কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তোমাকেও যে ক্রুদ্ধ হইতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। যদি কেহ নিজেকে হীন করিয়া ফেলে, তোমাকেও যে সেই হীন স্তরে নামিতে হইবে, তার কি মানে? ... 'অন্য লোক বোকামি করিয়াছে বলিয়া আমিও রাগ করিব? অশুভকে প্রতিরোধ করিও না।' ঈশ্বরপ্রেমিকগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। জগৎ যাহাই করুক, যে ভাবেই ইহা চলুক, (তাঁহাদের উপর) ইহা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

জনৈক যোগী অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'দেখ, আমার কী শক্তি! আকাশের দিকে তাকাও; আমি ইহাকে মেঘ দিয়া ঢাকিয়া দিব।' বৃষ্টি আরম্ভ হইল। (কেহ) বলিল, 'প্রভু, অদ্ভুত আপনার শক্তি! কিন্তু আমাকে তাহাই শিক্ষা দিন, যাহা পাইলে আমি আর কোন কিছু চাহিব না।' ... শক্তিরও ঊর্ধ্বে যাওয়া—কিছুই চাই না,

শক্তিলাভেরও বাসনা নাই! (ইহার তাৎপর্য) শুধু বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না। ... হাজার হাজার বই পড়িয়াও তুমি জানিতে সমর্থ হইবে না ... যখন আমরা ইহা বুঝিতে আরম্ভ করি, সমুদয় জগৎ-রহস্য যেন আমাদের সম্মুখে খুলিয়া যায়। ... একটি ছোট মেয়ে তাহার পুতুল লইয়া খেলিতেছে—সব সময় সে নূতন নূতন স্বামী পাইতেছে, কিন্তু যখন তাহার সত্যকারের স্বামী আসে, তখন (চিরদিনের জন্য) সে তাহার পুতুল-স্বামীগুলি দূরে ফেলিয়া দেয়। ... জগতের সবকিছু সম্বন্ধে ঐ একই কথা। (যখন) প্রেমসূর্য উদিত হয়, তখন এই-সব খেলার শক্তি-সূর্য—এই সমস্ত (কামনা-বাসনা) অন্তর্হিত হয়। শক্তি লইয়া আমরা কি করিব? যেটুকু শক্তি তোমার আছে, তাহা হইতেও যদি অব্যাহতি পাও তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। ভালবাসিতে আরম্ভ কর। ক্ষমতার মোহ নিশ্চয়ই কাটান চাই। আমার ও ভগবানের মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কিছুই যেন খাড়া না হয়। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর কিছুই নন; আদিতে প্রেম, মধ্যে প্রেম—অন্তেও প্রেম।

এক রানীর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। তিনি রাস্তায় রাস্তায় (ভগবৎপ্রেমের বিষয়) প্রচার করিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেশের সর্বত্র অত্যন্ত নির্যাতন করিয়া তাড়া করিতেন। রানী তাঁহার ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিয়া গান গাহিতেন। তাঁহার গানগুলি সর্বত্র গীত হয়। 'চোখের জলে আমি (প্রেমের অক্ষয়লতা পুষ্ট করিয়াছি)'।৮ ইহাই চরম, মহান্ (লক্ষ্য)। ইহা ব্যতীত আর কি আছে? (লোকে) ইহা চায়, উহা চায়। তাহারা সবাই পাইতে ও সঞ্চয় করিতে চায়। এই জন্যই এত কম লোক (প্রেম) বুঝিতে পারে, এত কম লোক ইহা লাভ করিতে পারে। তাহাদিগকে জাগাও এবং বল। তাহা হইলে তাহারা এ-বিষয়ে আরও কিছু সঙ্কেত পাইবে।

প্রেম স্বয়ং শাশ্বত, অন্তহীন ত্যাগ-স্বরূপ। তোমাকে সবকিছু ছাড়িতে হইবে। কিছুই তোমার অধিকারে রাখা চলিবে না। প্রেম লাভ করিলে তোমার আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। ... 'চিরকালের জন্য কেবল তুমিই আমার ভালবাসার ধন থাকিও।' প্রেম ইহাই চায়। 'আমার প্রেমাস্পদের অধরোষ্ঠের একটি মাত্র চুম্বন! আহা, যে তোমার চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার সমস্ত দুঃখ যে চলিয়া গিয়াছে। একটি মাত্র চুম্বনে মানুষ এত সুখী

হয় যে, অন্য বস্তুর উপর ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে শুধু তোমারই স্তুতিতে মগ্ন থাকে, আর একমাত্র তোমাকেই দেখে।'৯ মানবীয় ভালবাসাতেও (দিব্য প্রেমের সত্তা লুকান থাকে)। গভীর প্রেমের প্রথমক্ষণে সমস্ত জগৎ যেন এক সুরে তোমার হৃদয়-বীণার সঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বিশ্বের প্রত্যেকটি পাখি যেন তোমারই প্রেমের গান গাহিয়া থাকে, প্রতিটি ফুল যেন তোমার জন্যই ফুটিয়া থাকে। চিরন্তন অসীম প্রেম হইতেই (মানবীয়) ভালবাসা উদ্ভূত।

ঈশ্বরপ্রেমিক কোন কিছুকে ভয় করিবেন কেন? দস্যু-তস্করের, দুঃখ-দুর্বিপাকের—এমন কি নিজের জীবনের ভয়ও তাঁহার নাই। ... প্রেমিক অনন্ত নরকে যাইতেও প্রস্তুত, কিন্তু উহা কি নরক থাকিবে? স্বর্গ, নরক—এই-সব ধারণা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর প্রেম আস্বাদন করিতে হইবে। ... শত শত লোক প্রেমের অনুসন্ধানে তৎপর, কিন্তু উহা আসিলে ভগবান্ ছাড়া আর সবই অদৃশ্য হইয়া যায়।

অবশেষে প্রেম, প্রেমাস্পদ এবং প্রেমিক এক হইয়া যায়। ইহাই লক্ষ্য। ... আত্মা ও মানুষের মধ্যে এবং আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে কেন? ... কেবল এই প্রেম উপভোগ করিবার জন্য। ঈশ্বর নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন, সেই জন্য তিনি নিজেকে নানা ভাগে বিভক্ত করিলেন। ... প্রেমিক বলেন, 'সৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্য ইহাই'। আমরা সকলেই এক। 'আমি ও আমার পিতা এক।' এইক্ষণে ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জন্য আমি পৃথক্ হইয়াছি। ... কোন্‌টি ভাল—চিনি হওয়া, না চিনি খাওয়া? চিনি হওয়া—তাহাতে আর কী আনন্দ? চিনি খাওয়া—ইহাই হইল প্রেমের অনন্ত উপভোগ।

প্রেমের সমগ্র আদর্শ—(ঈশ্বরকে) আমাদের পিতা, মাতা, সখা, সন্তানভাবে (ভাবিবার প্রণালী—ভক্তিকে দৃঢ় করিবার এবং গভীরতরভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য)। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই ভালবাসার তীব্র অভিব্যক্তি। ঈশ্বরকে এইভাবেও ভালবাসিতে হইবে। নারী তাহার পিতাকে ভালবাসে,—মাতা, সন্তান এবং বন্ধুকেও ভালবাসে; কিন্তু পিতা, মাতা, সন্তান বা বন্ধুর কাছে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল একজনের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই থাকে না। এইরূপ পুরুষের পক্ষেও। ... পতি-

পত্নীর সম্পর্ক সর্বাঙ্গীণ। এই সম্পর্কে অন্য সব ভালবাসা একীভূত হইয়াছে। পত্নী স্বামীর মধ্যে পিতা মাতা, সন্তান সবই পায়। স্বামীও পত্নীর মধ্যে মাতা, কন্যা প্রভৃতি সবকিছু লাভ করে। স্ত্রী-পুরুষের এই সর্বগ্রাসী পরিপূর্ণ প্রেম ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে—যে-প্রেম নারী সম্পূর্ণ নির্ভয়ে লজ্জা না করিয়া, রক্তের সম্বন্ধ না মানিয়া তাহার প্রিয়তমকে নিবেদন করে। কোন অন্ধকার নাই। তাহার নিজের নিকট হইতে যেমন গোপন করিবার কিছু নাই, সেইরূপ তাহার প্রেমাস্পদের নিকটেও গোপনীয় বলিতে কিছুই থাকে না। এইরূপ প্রেম (ঈশ্বরের উপর) আসা চাই। এই বিষয়গুলি ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। তোমরা ধীরে ধীরে এই-সব বুঝিতে পারিবে, তখন সমস্ত যৌন ভাবও দূরে চলিয়া যাইবে। ‘তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম’ এই জীবন ও ইহার সকল সম্পর্কগুলি।

তিনি স্রষ্টা ইত্যাদি—এই-সমস্ত ধারণা তো বালকদিগের উপযুক্ত। তিনি আমার প্রিয়, আমার জীবন—ইহাই আমার অন্তরের ধ্বনি হউক। ...

‘আমার একমাত্র আশা আছে। লোকে তোমাকে বলে জগতের প্রভু।১০ ভালমন্দ, ছোটবড় সবই তুমি। আমিও তোমার এই জগতের অংশ এবং তুমিও আমার প্রিয়। আমার শরীর, মন, আত্মা তোমারই পূজাবেদীতলে। হে প্রিয়, আমার এই উপহারগুলি প্রত্যাখ্যান করিও না।’

৯. প্রেমের ধর্ম

[১৮৯৫ খ্রীঃ ১৬ নভেম্বর লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি]

অনুভূতির গভীরে উপনীত হতে প্রতীক-উপাসনা এবং অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে যাবার প্রয়োজন মানুষের আছে বলেই ভারতবর্ষে আমরা বলে থাকি, ‘কোন ধর্মমতের গণ্ডীর মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু সেই মত নিয়েই মরা ভাল নয়।’ চারাগাছকে রক্ষা করার জন্য বেড়ার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু চারা যখন বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন বেড়াই আবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রাচীন পদ্ধতিগুলি সমালোচনা ও নিন্দা করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা ভুলে যাই যে, ধর্মের ক্রমবিকাশ অবশ্যই থাকবে।

আমরা প্রথমে সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা করি, এবং তাঁকে স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি বলে বিশেষিত করে থাকি। কিন্তু প্রেমের সঞ্চার হলে ঈশ্বর শুধু প্রেমস্বরূপ হয়ে যান। ঈশ্বর কী—তা নিয়ে প্রেমিক ভক্ত মাথা ঘামায় না, কারণ সে তাঁর কাছে কিছুই চায় না। জনৈক ভারতীয় সাধক বলেছেন, ‘আমি তো আর ভিক্ষুক নই।’ আর সে ভয়ও করে না। ভগবানকে মানুষেরই মত ভালবাস।

ভক্তিভাবাশ্রিত কয়েকটি সাধনপ্রণালীর উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে। (১) শান্তঃ সহজ শান্তিপূর্ণ অনুরাগ—পিতৃত্ব ও সাহায্যের একটা ভাব মিশ্রিত; (২) দাস্যঃ সেবাভাবের আদর্শ; ঈশ্বর প্রভু বা অধ্যক্ষ বা সম্রাট্‌রূপে দণ্ড ও পুরস্কারদানে রত; (৩) বাৎসল্যঃ ঈশ্বরে সন্তানভাব। ভারতবর্ষে মা কখনই শাস্তি দেন না। এ-সব অবস্থার প্রত্যেকটিতে উপাসক ঈশ্বরের এক-একটি আদর্শ গ্রহণ করে তদনুযায়ী সাধন করে। তারপর (৪) ভগবান্ হন সখা; সখ্যভাবে কোন ভয় নেই। এতে সমতা ও অন্তরঙ্গতার ভাবও আছে। অনেক হিন্দুসাধক ঈশ্বরকে সখা ও খেলার সাথী জ্ঞানে উপাসনা করে। তারপর (৫) মধুর-ভাবঃ মধুরতম প্রেম, পতি-পত্নীর প্রেম। সেণ্ট টেরেসা এবং ভাবাবিষ্ট সাধকগণ—এর দৃষ্টান্ত। পারসীকদের মধ্যে কান্তাভাবে এবং হিন্দুদের মধ্যে পতিরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করার রীতি

আছে। মহীয়সী রানী মীরাবাঈ- এর কথা আমাদের মনে পড়ে; তিনি ভগবানকে পতি বলে প্রচার করতেন। অনেকের মত এত চরমে পৌঁছেছে যে, তাদের কাছে ঈশ্বরকে ‘সর্বশক্তিমান্’ বা ‘পিতা’ বলা যেন অধর্ম। এ-ভাবের উপাসনার ভাষা প্রণয়মূলক। এমন কি কেউ কেউ অবৈধ প্রণয়ের ভাষাও ব্যবহার করে থাকেন। কৃষ্ণ ও ব্রজগোপিকাদের কাহিনী এই পর্যায়ভুক্ত। তোমাদের হয়তো ধারণা যে, এই ভাবের উপাসনায় সাধকের অত্যন্ত অধোগতি হয়। তা হয়ও বটে। তথাপি অনেক বড় বড় সাধকের জীবনে উন্নতিও হয়েছে এই ভাবের মধ্য দিয়ে। এমন কোন মানবীয় বিধান নেই, যার অপব্যবহার হয়নি। ভিখারী আছে বলে কি তুমি রান্না বন্ধ রাখবে? চোরের ভয়ে তুমি কি নিঃস্ব হয়েই কাটাবে? ‘হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটি চুম্বনের একবার মাত্র আস্বাদন আমাকে পাগল করে তুলেছে!’ ১১

এই ভাবে আরাধনার ফলে কেউ বেশীদিন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকতে বা আচার-অনুষ্ঠানাদি মেনে চলতে পারে না। ভারতে ধর্ম মুক্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এ মুক্তিও ত্যাগ করতে হয়, তখন শুধু প্রেমের জন্যই প্রেম।

সর্বশেষে আসে নির্বিশেষ প্রেম—আত্মা। একটি পারসী কবিতায় বর্ণিত আছে, জনৈক প্রণয়ী তার প্রণয়িনীর ঘরের দরজায় ঘা দিল। প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করল ‘কে তুমি?’ প্রেমিক উত্তর দিল, ‘তোমারই প্রিয়তম অমুক।’ প্রেমিক শুধু বলল, ‘আমি তো এমন কাউকে চিনি না! তুমি চলে যাও!’ ... এভাবে চতুর্থবারও যখন প্রশ্ন করল, তখন প্রেমিক বলে উঠল, ‘প্রিয়তম, আমি তো তুমিই, অতএব দরজা খোল।’ অবশেষে দরজা খুলে গেল।

প্রেমিকার ভাষায় অনুরাগ বর্ণনা করে জনৈক মহান্ সাধক বলেছেনঃ ‘চার চোখের মিলন হল। দুটি আত্মায় যেন কি পরিবর্তন হয়ে গেল! এখন আর আমি বলতে পারি না—তিনি পুরুষ এবং আমি নারী, অথবা তিনি নারী এবং আমি পুরুষ। শুধু এটুকুই স্মৃতিতে আছে যে, আমরা দু-টি আত্মা ছিলাম। অনুরাগের আবির্ভাবে এক হয়ে গেছি।’ ১২

সর্বোচ্চ প্রেমে শুধু আত্মারই মিলন। অন্য যত রকম ভালবাসা, সবই দ্রুত বিলীয়মান। শুধু আত্মিক প্রেমই স্থায়ী হয়, এবং ক্রমশঃ বেড়ে যায়।

প্রেম দেখে আদর্শটি। এটি ত্রিভুজের তৃতীয় কোণ। ঈশ্বর কারণ, স্রষ্টা ও পিতা। প্রেম হচ্ছে চরম পরিণতি। কুঁজো সন্তানের জন্য মা অপেক্ষা করেন, কিন্তু দিন কয়েক লালন-পালনের পরই তাকে স্নেহ করেন এবং সব চেয়ে সুন্দর মনে করেন। কৃষ্ণাঙ্গ ইথিওপের ললাটে প্রেমিক সুন্দরী হেলেনেরই রূপ দেখে। এ-সব ব্যাপার আমরা সাধারণতঃ উপলব্ধি করতে পারি না। ইথিওপের ললাট উপলক্ষ মাত্র; প্রেমিক তো দেখে হেলেনকেই। উপলক্ষের উপর তার আদর্শটি প্রক্ষেপ করা হয়, এবং আদর্শ তাকে আবৃত করে—শুক্তি যেমন বালুকণাকে মুক্তায় রূপান্তরিত করে। ঈশ্বর হচ্ছেন আদর্শ, যাঁর ভিতর দিয়ে মানুষ সব কিছু দেখতে পারে।

সুতরাং আমরা প্রেমকেই ভালবাসছি। এই প্রেম মুখে প্রকাশ করা যায় না। কোন বাক্যই তা উচ্চারণ করতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা মৌন।

ইন্দ্রিয়গুলি প্রেমে অতিশয় উন্নত হয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানবীয় ভালবাসা গুণ-মিশ্রিত। অন্যের মনোভাবের উপর তা নির্ভরশীলও বটে। প্রেমের এই পারস্পরিক নির্ভরতাকে ব্যক্ত করার শব্দ ভারতীয় ভাষাগুলিতে আছে। সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ভালবাসা হচ্ছে স্বার্থযুক্ত; তাতে শুধু ভালবাসা পাবার সুখই আছে। আমরা ভারতবর্ষে বলি, 'একজন গাল পেতে দিচ্ছে, আর একজন চুম্বন করছে।' পারস্পরিক প্রেম এর ঊর্ধ্বে। কিন্তু এও থাকে না। যথার্থ প্রেম সর্বস্ব-ত্যাগে। এ-অবস্থায় আমরা অন্যকে দেখতে অথবা আমাদের আবেগকে প্রকাশ করবার মত কিছু করতেও চাই না। দেওয়াটাই যথেষ্ট। এভাবে মানুষকে ভালবাসা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরকে ভালবাসা সম্ভব।

বালকেরা রাস্তায় ঝগড়া করতে করতে যদি ভগবানের নামে শপথ করে, ভারতবর্ষে তাতে কোন ঈশ্বরনিন্দা হয় না। আমরা বলি, আগুনে হাত দাও—তুমি অনুভব কর আর নাই কর,

তোমার হাত পুড়বেই। তেমনি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করলে কল্যাণ ছাড়া আর কিছু হবে না।

ঈশ্বরনিন্দার ভাবটি এসেছে য়াহুদীদের কাছ থেকে; য়াহুদীরা পারসীকদের আনুগত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ঈশ্বর বিচারকর্তা ও শাস্তা–এ-ভাবটি মন্দ না হলেও নিম্নস্তরের ও স্থূল। ত্রিভুজের তিনটি কোণঃ প্রেম কিছু চায় না; প্রেমে কোন ভয় নাই; প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শের জন্য।

'সেই প্রেমময় ভগবান্ যদি বিশ্বভুবন জুড়ে না থাকতেন, তবে কে-ই বা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারত, কে-ই বা এক মুহূর্ত ভালবাসতে পারত?'

আমরা অনেকেই দেখতে পাব যে, শুধু কর্ম করতেই আমরা জন্মেছি। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করব। ভগবানের প্রীতির জন্যই কাজ করা হয়েছে। বিফল হলেও দুঃখ করবার কিছু নাই। ভগবানের প্রীতির জন্যই তো যত কিছু কর্ম।

নারীর মধ্যে মাতৃ-ভাবটি খুব পরিস্ফুট। ঈশ্বরকে তাঁরা সন্তানভাবে উপাসনা করেন; যা কিছু করেন তার জন্য, কিছুই চান না।

ক্যাথলিক এই-সব গভীর তত্ত্বের অনেক কিছুই শেখায়, এবং একটু সংকীর্ণ হলেও অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ। আধুনিক সমাজে প্রোটেষ্টাণ্ট মত উদার হলেও অগভীর। সত্য কতখানি মঙ্গল করেছে, তা দ্বারা সত্যের বিচার করা–একটি শিশুকে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মতই অসঙ্গত।

সমাজ হবে প্রগতিশীল। নিয়মকে অতিক্রম করে নিয়মের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করার প্রয়োজনেই আমরা তাকে স্বীকার করি। ত্যাগের অর্থই হচ্ছে–কেউই ঈশ্বর ও ধন-দেবতার উপাসনা একসঙ্গে করতে পারে না।

তোমাদের বিচার-বুদ্ধি ও প্রেম গভীর কর। তোমাদের হৃদয়-পদ্ম ফুটিয়ে তোল—মৌমাছি আপনিই এসে জুটবে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস রাখ,—তারপর ঈশ্বরে বিশ্বাস আসবে। মুষ্টিমেয় শক্তিধর মানুষই পৃথিবী তোলপাড় করে দিতে পারে। চাই পরের জন্য অনুভব করার সহানুভূতিশীল হৃদয়, উদ্ভাবনকারী মস্তিষ্ক, এবং কর্ম করার উপযোগী দৈহিক শক্তি। বুদ্ধ (মনুষ্যেতর) প্রাণিবর্গের জন্যও আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। নিজেকে কর্ম করার যোগ্য যন্ত্র করে তোল। কিন্তু ঈশ্বরই কর্ম করেন, তুমি কর না। একজনের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব রয়েছে। জড়বস্তুর একটি কণার মধ্যেই জগতের সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। হৃদয় মস্তিষ্কের যদি বিরোধ দেখ, তবে হৃদয়কেই অনুসরণ কর।

পূর্বে বিধান ছিল প্রতিযোগিতা, আজকের বিধান হচ্ছে সহযোগিতা। আগামীকাল কোন বিধি-বিধানই থাকবে না। ঋষিরা তোমায় সাধুবাদ করুন, অথবা জগৎ তোমায় ধিক্কার দিক্, ভাগ্য-লক্ষ্মী তোমার প্রতি প্রসন্না হোন অথবা দারিদ্র্য ও বস্ত্রহীনতা তোমায় ভ্রূকুটি করুক, একদিন হয়তো বনের লতাপাতা আহার করবে, আবার পরদিনই পঞ্চাশ উপকরণের বিরাট ভোজে অংশ গ্রহণ করবে, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না করে এগিয়ে যাও!১৩

[স্বামীজী তারপর প্রশ্নোত্তরে পওহারী বাবার কথা উল্লেখ করেন—কিভাবে সেই যোগী নিজের বাসনপত্রগুলি নিয়ে চোরের পিছনে ছুটেছিলেন এবং তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেন, ‘প্রভু, আমি জানতুম না যে, তুমি এসেছিলে! দয়া করে বাসনগুলি গ্রহণ কর। এগুলি তোমার! আমি তোমার সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর।’ স্বামীজী আরও বলেন, কিভাবে এক বিষধর সাপ সেই যোগীকে দংশন করে এবং সন্ধ্যার দিকে সুস্থ বোধ করে তিনি বলতে থাকেন, ‘আমার প্রিয়তমের কাছ থেকে দূত এসেছিল!’]

১০. বিল্বমঙ্গল

‘ভক্তমাল’ নামক একখানা ভারতীয় গ্রন্থ হইতে এই কাহিনীটি গৃহীত। এক গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিত। অন্য গ্রামের এক দুশ্চরিত্রা নারীর প্রতি সে প্রণয়াসক্ত হয়। গ্রাম দুইটির মধ্যে একটি বড় নদী ছিল। প্রত্যহ খেয়া-নৌকায় নদী পার হইয়া যুবক তাহার নিকট যাইত। একদিন যুবককে পিতৃশ্রাদ্ধাদির কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়; এজন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা সত্ত্বেও সেদিন সে মেয়েটির কাছে যাইতে পারিল না। হিন্দুসমাজের এই অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। যুবক ছটফট করিতে থাকিলেও তাহার কোন উপায় ছিল না। অনুষ্ঠান শেষ করিতে রাত্রি হইয়া গেল।

তখন ভীষণ গর্জন করিয়া ঝড় উঠিয়াছে। বৃষ্টি নামিল, প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে নদী বিক্ষুব্ধ হইল। নদী পার হওয়া বিপজ্জনক, তথাপি যুবক নদীতীরে উপস্থিত হইল। খেয়াঘাটে নৌকা নাই; এ দুর্যোগে মাঝিরা নদী পার হইতে ভয় পায়। যুবক কিন্তু যাইবার জন্য অস্থির; মেয়েটির প্রেমে সে পাগল; তাহাকে যাইতেই হইবে। একখণ্ড কাঠ ভাসিয়া আসিতেছিল, তাই ধরিয়া সে নদী পার হইল। অপর তীরে পৌঁছিয়া কাষ্ঠখণ্ডটি টানিয়া উপরে উঠাইল এবং প্রণয়িনীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহদ্বার বন্ধ; যুবক দ্বারে করাঘাত করিলেও ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দে কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। সুতরাং সে গৃহপ্রাচীরের চতুর্দিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যাহা দেখিতে পাইল, সেটিকেই প্রাচীর-লম্বিত রজ্জু বলিয়া মনে করিল।

‘অহো! প্রিয়া আমার আরোহণের জন্য রজ্জু রাখিয়া দিয়াছে!’—মনে মনে এই বলিয়া যুবক সযত্নে সেটিকে ধরিল। সেই রজ্জুর সাহায্যে সে প্রাচীরে আরোহণ করিল এবং অপর দিকে পৌঁছিয়া পা ফসকাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। একটা শব্দ শুনিয়া গৃহবাসিগণ জাগিয়া উঠিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া মেয়েটি যুবককে মূর্ছিত অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। যুবকের দেহ হইতে একটা উৎকট দুর্গন্ধ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ব্যাপার কি? তোমার গায়ে এমন দুর্গন্ধ কেন? কি করে আঙিনার

ভেতরে এলে?’ যুবক উত্তর করিল, ‘কেন, আমার প্রেমিকা কি প্রাচীরে একটা দড়ি ঝুলিয়ে রাখেনি?’ স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, ‘প্রেমিকা আবার কে? অর্থোপার্জনই আমাদের উদ্দেশ্য। তুমি কি মনে কর, তোমার জন্য আমি দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম? কি উপায়ে তুমি নদী পার হলে? ‘কেন, একটি কাষ্ঠখণ্ড ধরেছিলাম।’ মেয়েটি বলিল, ‘ চল, একবার দেখে আসি।’

যে রজ্জুর কথা বলা হইয়াছে, উহা ছিল একটা বিষধর গোখুরা সাপ, তাহার সামান্য স্পর্শেই মৃত্যু নিশ্চিত। সাপটার মাথা ছিল একটা গর্তের মধ্যে। সাপের গর্তে প্রবেশ করার সময় যুবক দড়ি মনে করিয়া তাহার লেজটা ধরিয়াছিল। প্রেমে পাগল হইয়াই সে এই কাজ করিয়াছিল। সাপের মুখ গর্তের মধ্যে এবং দেহ বাহিরে থাকিলে যদি কেহ তাহার লেজ ধরে, তবে সাপ তাহার মুখ গর্তের বাহিরে আনে না। এইজন্যই যুবক লেজ ধরিয়া প্রাচীর আরোহণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যুবক খুব জোরের সহিত লেজ টানিতে থাকায় সাপটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ‘কাষ্ঠখণ্ডটি কোথায় পেলে?’ উত্তর হইল, ‘কেন, নদীতে ভেসে আসছিল।’ বস্তুতঃ উহা ছিল একটি গলিত শব; নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইবার সময় কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া যুবক উহা ধরিয়াছিল। এখন বুঝা গেল, তাহার দেহে কেন ঐ দুর্গন্ধ। মেয়েটি যুবকের দিকে চাহিয়া বলিল, ‘প্রেমে আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না; আমরা কখনও প্রেমে বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ যদি প্রেম না হয়, তবে–ভগবান্ রক্ষা করুন! প্রেম কি তা আমরা জানি না; কিন্তু বন্ধু! আমার মত একজন নারীকে তুমি হৃদয় দান করিলে কেন? কেন তোমার হৃদয় ভগবানকে উৎসর্গ করলে না? এরূপ করলে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।’ –এই কথায় যুবকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ক্ষণিকের জন্য তাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। ‘ভগবান্ কি আছেন?’ ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধু, আছেন বৈ কি!’

যুবক সেই স্থান ত্যাগ করিল, এবং চলিতে চলিতে এক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে সাশ্রুনয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, ‘ প্রভু, আমি তোমাকে চাই। আমার এ প্রেম-প্রবাহ ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ে ধরে না। আমি সেই প্রেমের সাগরকে ভালবাসিতে চাই, যেখানে

আমার প্রেমের এই প্রবল প্রবাহিণী গিয়া মিশিতে পারে; আমার প্রেমের এই বেগবতী নদী তো আর ক্ষুদ্র জলাশয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহা চায় অনন্ত সাগর। প্রভু, তুমি যেখানেই থাক, আমার কাছে এস।'

এইভাবে বহু বৎসর বনে কাটাইয়া তাহার মনে হইল, সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সে শহরে আসিল। একদিন সে নদীতীরে একটি স্নানের ঘাটে বসিয়াছিল, এমন সময় ঐ শহরের এক বণিকের সুন্দরী যুবতী পত্নী পরিচারিকা-সহ সেই স্থান দিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধের সেই পুরাতন ভাবটি আবার জাগিয়া উঠিল, সুন্দরীর সুন্দর মুখখানি তাহাকে আবার আকর্ষণ করিল। যোগী নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল এবং যুবতীকে তাহার গৃহ পর্যন্ত অনুসরণ করিল। মুহূর্তমধ্যে যুবতীর স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গৈরিকধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বলিল, 'মহারাজ, ভেতরে আসুন। আমি আপনার জন্য কি করিতে পারি?' যোগী উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার নিকট একটি ভয়ানক বস্তুর প্রার্থী?' 'মহারাজ, যে-কোন বস্তু চাইতে পারেন, আমি গৃহস্থ; যে যা চায়, আমি তাকে তাই দিতে প্রস্তুত।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আমি আপনার পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' গৃহস্থ বলিল, 'হা ভগবান্ এ কি! আমি তো পবিত্র, আমার স্ত্রীও পবিত্র; প্রভু সকলের রক্ষক। মহারাজ, স্বাগতম্, ভেতরে আসুন।' সন্ন্যাসী ভিতরে আসিতেই গৃহস্বামী স্ত্রীর নিকট তাঁহার পরিচয় দিল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?' সন্ন্যাসী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মা, আপনার চুল থেকে দুটো কাঁটা আমাকে দেবেন কি?' 'এই নিন্।' সন্নাসী সেই কাঁটা দুটি নিজের দুই চোখে সজোরে বিঁধিয়া দিয়া বলিলেন, 'দূর হ, দুর্বৃত্ত নয়ন-যুগল। এখন থেকে তোরা আর সম্ভোগ করতে পারবি না। যদি দেখতেই চাস, তবে অন্তশ্চক্ষু দিয়ে দেখ্—সে ব্রজের রাখালকে। এখন অন্তশ্চক্ষুই তোর সর্বস্ব।'

এইভাবে সন্ন্যাসী পুনরায় বনে ফিরিয়া গেলেন এবং আবার দিনের পর দিন ভগবানের কাছে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে প্রেমের যে উদ্দাম প্রবাহ বহিতেছিল, তাহাই সত্যলাভের জন্য সংগ্রাম করিতে লাগিল; পরিশেষে তিনি সিদ্ধি- লাভ করিলেন। তাঁহার

হৃদয়রূপ প্রেম-প্রবাহিণীর গতি ঠিক পথে পরিচালিত হইয়া তাঁহাকে রাখালরাজের নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

কাহিনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে, কৃষ্ণরূপে ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। পরে একবার মাত্র তাঁহার অনুতাপ আসিয়াছিল যে, তিনি চক্ষু হারাইয়া–কেবল অন্তর্দৃষ্টিই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রেমবিষয়ক কয়েকটি মনোরম কবিতা লিখিয়াছেন। সকল সংস্কৃত গ্রন্থেই লেখকেরা প্রথমে গুরুবন্দনা করেন। তাই বিল্বমঙ্গল সেই নারীকেই তাঁহার প্রথম গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

১১. বাল-গোপালের কাহিনী

একদিন শীতের অপরাহ্নে—পাঠশালায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হতে গোপাল নামে একটি ব্রাহ্মণ-বালক তার মাকে ডেকে বলল, 'মা, বনের পথ দিয়ে একা একা পাঠশালায় যেতে আমার বড় ভয় করে। অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে হয় চাকর না-হয় আর কেউ আসে। পাঠশালায় পৌঁছে দেবার জন্যও আসে, আবার বাড়ী নিয়ে যেতেও আসে। আমায় কেন কেউ সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসে না, মা?'

একটি গ্রাম্য-পাঠশালার ছাত্র গোপাল। সকালে-বিকালে তার পাঠশালা বসত। বিকালের ছুটির পর, শীতের দিনে, বাড়ি আসতে আসতে পথেই সন্ধ্যা হয়ে যেত। তাছাড়া পাঠশালার পথটিও নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে একেবেঁকে গিয়েছে। কাজেই অন্ধকারে একলাটি ঐ পথে আসতে গোপালের ভয় করত।

গোপালের মা বিধবা। শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন নিয়েই গোপালের বাবার দিন কাটত, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। আবার তাঁর মৃত্যুর পর দুঃখিনী বিধবা তার মা যেন বিষয়-ব্যাপার থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিলেন, যদিও সে-সবের সঙ্গে যোগাযোগ কোনদিনই তাঁর বেশী ছিল না। তখন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান-উপাসনা, যম-নিয়ম প্রভৃতি পালন করে চরম-মুক্তিদাতা যে মৃত্যু, তারই জন্য ধৈর্য সহকারে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অন্তরে আশা ছিল—মৃত্যুর পরপারে, অন্তহীন জীবনের পথে, যিনি তাঁর ভাল-মন্দের সাথী, সুখ-দুঃখের অংশভাগী সেই দয়িতের সঙ্গে আবার মিলিত হবেন। ...

নিজের একটি পর্ণকুটিরেই তিনি বাস করতেন। তাঁর স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিসাবে একখণ্ড ধানজমি কেউ তাঁকে দান করেছিল। সে-জমিতে যে ধান উৎপন্ন হতে—বিধবার প্রয়োজনের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। এ-ছাড়া, কুটিরটিকে ঘিরে আরও কিছু

জমি ছিল। সেখানে বাঁশ-ঝাড় ছিল, কয়েকটি নারিকেল গাছ ছিল, আর ছিল দু-চারটি আম ও লিচুর চারা। গ্রামবাসীদের সাহায্যে সেগুলি থেকেও প্রচুর ফলমূল পাওয়া যেত। এরও উপর আর যা লাগত, তার জন্য প্রতিদিন অনেকটা সময় তিনি চরকায় সুতা কাটতেন। ...

প্রভাতের প্রথম স্বর্ণ-কিরণ তালগাছের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিফলিত হবার বহুপূর্বে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। তখনও প্রভাতী পাখির কল-কাকলি শুরু হতে না। একটি সামান্য মাদুর আর তার উপর বিছানো একখানা কম্বল—এই ছিল তাঁর শয্যা। সেই দীন শয্যাটিতে বসে অতি প্রত্যুষ থেকে তিনি নামগান আরম্ভ করতেন। পুণ্যশ্লোকা নারীদের পূত চরিতকথা কীর্তন করতেন, ঋষিদের প্রণাম জানাতেন, আর জপ করতেন। জপ করতেন মানুষের পরমাশ্রয় নারায়ণের নাম, করুণাময় মহাদেবের নাম, আর জগত্তারিণী তারাদেবীর নাম। সর্বোপরি অন্তরের সর্ব-আকৃতি নিবেদন করতেন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দেবতা—শ্রীকৃষ্ণের কাছে, যিনি করুণায় বিগলিত হয়ে মানুষের শিক্ষার জন্য, ত্রাণের জন্য বাল-গোপালমূর্তিতে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে প্রার্থনার ফলে তাঁর অন্তরে এক বিচিত্র আনন্দানুভূতি জেগে উঠত। মনে হতে তিনি যেন নিজস্বামীর সহিত একত্র হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার বাঞ্ছিত পথে আরও একটি দিন এগিয় গেলেন।

কুটিরের অনতিদূরে ছিল একটি নদী। দিবারম্ভের পূর্বেই সেই নদীতে তাঁর স্নান হয়ে যেত। স্নানকালে তাঁর প্রার্থনা ছিল—'হে দেবতা, নদীর নির্মলজলে স্নান করে দেহটি আমার যেমন পবিত্র হল—স্নিগ্ধ হল, তোমার করুণায় আমার অন্তরটিও যেন তেমনি পবিত্র—তেমনি স্নিগ্ধ হয়ে যায়।'

তারপর সদ্যোধৌত শুদ্ধ একটি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে তিনি পুষ্প-চয়ন করতেন, সুগন্ধ চন্দন প্রস্তুত করতেন বৃত্তাকৃতি চন্দন-পাটায়, এবং তুলসীপত্র আহরণ করে পূজার উদ্দেশ্যে ছোট ঠাকুরঘরটিতে প্রবেশ করতেন। সে ঘরে তাঁর বাল-গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি রেশমী চন্দ্রাতপের নীচে, সুদৃশ্য দারু-নির্মিত সিংহাসনে, ভেলভেটের

কোমল গদির উপরে, প্রায় পুষ্পাবৃত অবস্থায় থাকত শ্রীকৃষ্ণের সে ধাতুনির্মিত বাল-গোপাল মূর্তিটি।

মায়ের প্রাণ শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে কল্পনা করেই শুধু তৃপ্তিলাভ করত। তাঁর স্বামী জীবিতকালে কতদিন কতবার বেদোক্ত সেই নিরাকার, নিরবয়ব, নৈর্ব্যক্তিক দেবতার বর্ণনা তাঁকে শুনিয়েছেন। সর্ব-অন্তর দিয়ে সে-সব অনবদ্য কাহিনী তিনি শ্রবণ করতেন, অকুণ্ঠচিত্তে ধ্রুব সত্য বলে সেগুলি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু হায়! শিক্ষাহীন ও শক্তিহীন এক নারীর পক্ষে সে বিরাটকে ধারণা করা কিরূপে সম্ভব? তাছাড়া শাস্ত্রে তো এ-কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে—যে যে-ভাবে আমাকে ভজনা করে, সে সে-ভাবেই আমাকে লাভ করে থাকে। মানুষ যুগে যুগে আমারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে থাকে।—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

এবং ঐ ভাবটিতেই তাঁর অন্তর ভরে যেত, অতিরিক্ত আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না।

এইভাবেই কাটছিল তাঁর জীবন। হৃদয়ের সকল ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণে তিনি সমর্পণ করেছিলেন এবং সে সমর্পণটি বিশেষভাবে তাঁর ক্ষুদ্র ধাতু-বিগ্রহটিকে ঘিরেই নিয়ত লুতাতন্তুর মত আবর্তিত হত। তাছাড়া ভগবানের এ-বাণীটিও তার শোনা ছিল—

'রক্তমাংসের তৈরী মানুষকে তুমি যেমন সেবা কর, আমাকেও তেমনি প্রেম পবিত্রতা দিয়ে সেবা কর। আমি সেই সেবা গ্রহণ করব।'

সুতরাং সেবাই তিনি করতেন; যে-ভাবে নিজ প্রভুকে মানুষ সেবা করে, যে-ভাবে সেবা করে গুরুকে, সর্বোপরি তাঁর নয়নের নিধি পুত্রকে, একমাত্র সন্তানকে তিনি যেভাবে সেবা করতেন—শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনিভাবেই সেবা করতেন। প্রতিদিন ধাতুমূর্তিটিকে তিনি স্নান করাতেন, সাজাতেন, ধূপধুনা দিতেন তাঁর সামনে। কিন্তু ভোগ বা নৈবেদ্য? হায়, দরিদ্র

বিধবার সে সামর্থ্য কোথায়? দুঃখে তাঁর চোখে জল আসত, আর সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করতেন স্বামীর কাছে শোনা সেই শাস্ত্রবচন, ভগবানের সেই অভয়-উক্তি–পত্র, পুষ্প, ফল, জল,–ভক্তির সঙ্গে যে আমাকে যা-কিছু দান করে, আমি তাই গ্রহণ করে থাকি।–

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

সুতরাং তাঁর প্রার্থনা ছিল এই মন্ত্রেঃ হে দেবতা, এই বিপুলা পৃথিবীতে কত বিচিত্র কুসুম তোমারই প্রীতির জন্য নিয়ত ফুটে উঠেছে, তবু আমার তুচ্ছ বনফুল ক-টি গ্রহণ কর। তুমি বিশাল বিশ্বের অন্নদাতা, তথাপি আমার সামান্য ফলের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। আমি শক্তিহীন, শিক্ষাহীন। তুমিই আমার দেবতা, আমার প্রাণের রাখাল, আমার পুত্র। তুমি কৃপা করে আমার পূজা-অর্চনা সার্থক কর, আমার প্রেম কামনাহীন কর। ...

পূজার ফল বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে ফলও তুমিই গ্রহণ কর। আমাকে দাও প্রেম, শুধু প্রেম–যে-প্রেম অন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না, প্রেম ভিন্ন আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না।

হয়তো আকস্মাৎ কোনদিন গ্রামের বাউল-বৈরাগী মায়ের ক্ষুদ্র আঙিনাটিতে এসে দাঁড়ায় এবং প্রভাতী সুরে গান ধরে–

শোনরে মানুষ ভাই,
প্রেমের কথা কয়ে যাই
(আমি) জ্ঞানের ডাকে ভয় করিনে–
প্রেমের ডাকে করি ভয়,
আমার আসন কাঁপে
প্রেমের ডাকে,
প্রেমাশ্রুতে হই উদয়।
নিত্যমুক্ত যেই ভগবান্

নিরবয়ব ব্রহ্ম যেই,
প্রেমের দায়ে নররূপে
তারি খেলা দেখতে পাই;
তারি লীলা জানতে পাই।
বৃন্দাবনের কুঞ্জছায়ে
জ্ঞানের কিবা প্রকাশ ছিল?
রাখাল-বালক গোপ-বালিকা
শাস্ত্র কবে পড়েছিল?
কিন্তু তারা প্রেমিক ছিল,
ছিল ভালবাসায় ভরা,
তাইতো তাদের প্রেমের পাশে
আমি চির রইনু ধরা।

এমনি করে তাঁর মাতৃহৃদয় যেন ভাগবত সত্তার মধ্যেই নিজের পুত্রটিকে লাভ করেছিল এবং দেব-গোপালের নামানুসারে পুত্রের নামও তিনি রেখেছিলেন—গোপাল। তাকে অবলম্বন করেই এ-জগতের বুকে নিজের মনটিকে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। নতুবা পার্থিব-বন্ধনহীন তাঁর মন মুহুর্মুহুঃ জাগতিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে ধাবিত হত। এ মাটির পৃথিবীতে তাঁর যে প্রাত্যহিক জীবন, তা ছিল যেন অনেকটা কলের মত, নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত। বস্তুতঃ তাঁর চলাফেরা, তাঁর চিন্তা সুখ, এক কথায় তাঁর সমগ্র জীবনটুকু কি ঐ ক্ষুদ্র বালকটিকে ঘিরেই আবর্তিত ছিল না? হ্যাঁ, তাই ছিল।

বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তিনি তাঁর মাতৃহৃদয়ের সকল কোমলতা দিয়ে ঐ শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেছেন। আজ সে পাঠশালায় যাবার মত বড় হয়েছে, পাঠশালায় সে যাবে। তাই ছাত্রজীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো সংগ্রহ করবার জন্য মার কত দীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম!

প্রয়োজন অবশ্য খুব বেশী ছিল না। যে-দেশে মাটির প্রদীপে একছটাক তেল ঢেলে আর একটা কাপড়ের সলতে লাগিয়ে আলো জ্বেলে প্রফুল্ল চিত্তে মানুষ বিদ্যাচর্চায় দিন কাটায়, যেখানে ঘাসের তৈরী একটি মাদুর ভিন্ন আর কোন আসবাব-পত্রেরই প্রয়োজন হয় না, সে-দেশের ছাত্রজীবনের প্রয়োজন খুব বেশী হবার কথাও নয়। তবু সামান্য যে দু-চারটি জিনিষের প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করতেই দরিদ্র বিধবাকে বহুদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

দিনের পর দিন চরকায় সূতা কেটে গোপালের জন্য একখানা পরবার কাপড় এবং একখানা গায়ে দেবার চাদর তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সংগ্রহ করতে হয়েছিল মাদুর-জাতীয় ছোট একটি আসন, যার উপর দোয়াত, খাগের কলম প্রভৃতি রেখে গোপাল লিখবে এবং পরে যেটিকে গুটিয়ে বগলদাবা করে পাঠশালায় যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর ফিরবার সময় সঙ্গে নিয়ে আসবে।

তারপর যে-শুভদিনটিতে গোপালের বিদ্যারম্ভ হল, সে প্রথম অ, আ, লিখতে চেষ্টা করল–সে-দিনটি দুঃখিনী মায়ের কাছে যে কী আনন্দের দিন ছিল, তা মা ভিন্ন অন্যের পক্ষে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ? আজ তাঁর মনে একটি গভীর বিষাদের ছায়া পড়েছে। বনপথ দিয়ে একা যেতে-আসতে গোপাল ভয় পাচ্ছে, কে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? এর আগে কোনদিন নিজের বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য এমন করে তিনি ভাবেননি, অনুভব করেননি। মুহূর্তের জন্য চতুর্দিক্ যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল ভগবানের সেই চিরন্তন আশ্বাসবাণী–

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

একান্তভাবে–অনন্যচিন্ত হয়ে যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করে, আমি তার সকল ভার স্বয়ং বহন করে থাকি।

আর তাঁর বিশ্বাসী মন ঐ আশ্বাস-বাণীতেই একটি আশ্রয় খুঁজে পেল। ...

তারপর চোখের জল মুছে ছেলেকে বললেন, ‘ ভয় কি বাবা! ঐ বনে আমার আর একটি ছেলে থাকে, তারও নাম গোপাল। সে তোমার বড় ভাই। বনভূমির অন্ধকার পথে যখন তুমি ভয় পাবে, তখন তোমার দাদাকে ডেক।’

বিশ্বাসী মায়ের পুত্র গোপাল। সেও তাই সকল অন্তর দিয়েই মার কথা বিশ্বাস করল। ...

তারপর সেদিন অপরাহ্ণে—পাঠশালা থেকে ফেরার পথে অরণ্যভূমির নিবিড়তায় ভয় পেয়েই মায়ের নির্দেশ অনুসারে বালক তার বনের ভাইটিকে ডাক দিল—‘গোপাল-দাদা, তুমি কি এখানে আছ? মা বলেছেন, তুমি এই বনে থাক; বলেছেন, তোমাকে ডাকতে। একলাটি আমার বড় ভয় করছে, ভাই!’

তখন দূর বনান্তরাল থেকে শব্দ ভেসে এল—‘ভয় নেই ভাই, এই তো আমি রয়েছি। ভয় কিসের, তুমি বাড়ি যাও।’

সেদিন থেকে, এমনি করে দিনের পর দিন গোপাল তার বনের দাদাকে ডাকে, আর একই স্বর শুনতে পায়। বাড়ি এসে মাকে সে-সব কথা সে বলে, আর মা বিস্ময়ে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে শোনেন সে কাহিনী। তারপর একদিন মা তাকে বললেন—‘বাবা, এরপর যখন তোমার রাখাল দাদার সঙ্গে দেখা হবে, তখন তাকে বল সে যেন তোমাকে দেখা দেয়।’ ...

পরদিন যথাকালে বনপথে যাবার সময় গোপাল তার ভাইকে ডাক দিল এবং পূর্বের মত উত্তরও এল বন থেকে। কিন্তু এবার মার কথামত গোপাল তার দাদাকে দেখা দেবার জন্য একান্ত অনুরোধ করল। বলল, ‘গোপাল দাদা, তোমাকে তো কোনদিন আমি দেখিনি। আজ আমাকে দেখা দাও।’

তখন উত্তর শোনা গেল, ‘ভাই, এখন বড় ব্যস্ত আছি। আজ আমি আসতে পারব না।’ কিন্তু গোপাল ছাড়বে না, সে বার বার কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগল। তখন অকস্মাৎ

বনের ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এল বনের রাখাল। পরনে গোপালকের বেশ, মাথায় ছোট্ট মুকুট–তাতে বসানো শিখিপুচ্ছ, হাতে বাঁশের বাঁশী।

দুইটি বালকই তখন মহাখুশী। একসঙ্গে তারা খেলা করল, গাছে উঠল, ফল কুড়াল, ফুল কুড়াল–বনের গোপাল আর দুঃখিনী মায়ের গোপাল–দু-টি ভাই। খেলতে খেলতে পাঠশালার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এল এবং গোপাল একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠশালার পথে চলে গেল।

সেদিন তার পাঠ প্রায় ভুল হয়ে গেছে। সমগ্র অন্তর উৎসুক হয়ে রয়েছে কেবল বনে ফিরে রাখাল দাদার সঙ্গে আবার খেলা করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায়। ...

এইভাবে কয়েকমাস সময় কেটে গেল। দিনের পর দিন সন্তানের বিচিত্র কাহিনী শুনতেন মা, আর ভগবানের অপার করুণার কথা চিন্তা করে নিজের দৈন্য বৈধব্য প্রভৃতি সব কিছু ভুলে যেতেন। দুঃখকে মনে মনে গ্রহণ করতেন ভগবানের অনন্ত আশীর্বাদ বলে।

এরপর পাঠশালার গুরুমশায়ের গৃহে একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের দিন এল। সে-কালে গ্রাম্য-পাঠশালার পণ্ডিতগণ একাই অনেকগুলি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতেন। নির্ধারিত বেতন হিসাবেও তাঁরা বিশেষ কিছু গ্রহণ করতেন না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপস্থিত হলে ছাত্রেরা নানা উপঢৌকন দিত শিক্ষককে এবং সে-সবের উপর তাঁরা অনেকাংশে নির্ভরও করতেন।

কাজেই গোপালের গুরুমশায়ও ছাত্রদের কাছে অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপঢৌকনের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং প্রত্যেক ছাত্র সাধ্যমত সে অনুরোধ রক্ষাও করল। কেউ দিল অর্থ, কেউ দিল অন্য কোন দ্রব্য-সামগ্রী। কিন্তু দুঃখিনী বিধবার পুত্র গোপাল! হায়, উপঢৌকনের সামগ্রী সে কোথায় পাবে? তাই অন্য পড়ুয়ারা একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে–কে কি দেবে, তার বিবরণ গোপালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে বেড়াতে লাগল।

সে রাত্রে মনে গভীর দুঃখ নিয়ে গোপাল মাকে সব কথা বলল। বলল—'গুরুমশায়ের জন্য কিছু দিতেই হবে।' কিন্তু মায়ের তো কোন সম্বলই নেই, কি দেবেন তিনি?

অবশেষে তিনি স্থির করলেন, যা চিরদিন করে এসেছেন জীবনের সর্বাবস্থায়, আজও তাই করবেন, রাখালরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করবেন। তাঁর কাছেই চাইবেন, যদি কিছু প্রয়োজন হয়। সুতরাং ছেলেকে বললেন, সে যেন তার বনের রাখাল-দাদার কাছে গুরুমশায়ের জন্য কিছু চেয়ে নেয়।

পরদিন বনের পথে রাখাল-দাদার সঙ্গে যথানিয়মে গোপালের দেখা হল, দুজনে কিছুক্ষণ খেলাধুলাও করল। তারপর বিদায় নেবার কালে গোপাল তার দুঃখের কথা জানাল রাখাল-দাদাকে, অনুরোধ করল গুরুমশায়কে দেবার মত কিছু উপহার সে যেন তাকে দেয়।

রাখাল বলল, 'ভাই গোপাল, আমি সামান্য বনের রাখাল। মাঠে মাঠে গোরু চরাই। আমার তো টাকা-পয়সা নেই, ভাই। তবে তোমার রাখাল-দাদার উপহারস্বরূপ এই ছোট ক্ষীরের বাটিটি তুমি নাও, এইটি তোমার গুরুমশাকে উপহার দিও।'

গোপালের তখন আনন্দ আর ধরে না। একে তো গুরুমশায়ের জন্য কিছু উপহার হাতে পেয়েই সে খুশী, তার উপর সে-উপহার এসেছে রাখাল-দাদার কাছ থেকে। অতি দ্রুত সে পাঠশালায় চলে গেল। পাঠশালার অন্যান্য ছাত্রেরা তখন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে এক এক করে গুরুমশায়ের হাতে তাহাদের উপহার তুলে দিচ্ছে। গোপালও কম্পিতবক্ষে সবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভাল ভাল উপহার ছিল, সুতরাং পিতৃহীন দরিদ্র বালকের তুচ্ছ উপহারের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না।

সে-তাচ্ছিল্যে গোপাল যেন দমে গেল, দুঃখে তার চোখে জল এল। অবশেষে হঠাৎ গুরুমশায়ের চোখ পড়ল তার দিকে। তিনি তখন তার হাত থেকে ক্ষীরের পাত্রটি নিয়ে অন্য একটি বৃহৎ পাত্রে ঢেলে দিলেন। কিন্তু একি! মুহূর্তে সে শূন্যপাত্র আবার ক্ষীরে পূর্ণ

হয়ে গেল! আবার ঢাললেন, আবারও পূর্ণ হল! এমনি যতবার তিনি ঢালেন, ততবারই পাত্রটি মুহূর্তে ভরে ওঠে!

উপস্থিত সকলে তো একেবারে স্তম্ভিত। গুরুমশায় তখন দু-হাতে গোপালকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'এ-পাত্র তুই কোথায় পেলি, বাবা?'

গোপাল তখন পণ্ডিতমশায়ের কাছে তার বনের রাখাল-দাদার কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করল। কেমন করে সে তাঁকে প্রতিদিন ডাকে এবং সাড়া পায়; কেমন করে প্রতিদিন দু-জনে তারা খেলা করে এবং কেমন করে ঐ ক্ষীরের ছোট পাত্রটিও রাখাল-দাদার হাত থেকেই সে পেয়েছে।

সব কথা শুনে গুরুমশায় তখনই তার সঙ্গে বনে গিয়ে সেই অদ্ভুত রাখাল-বালককে দেখতে চাইলেন এবং গোপালও মহানন্দে তাঁকে নিয়ে চলল। বনস্থলীতে গিয়ে অন্যদিনের মত আজও সে তার দাদাকে ডাকল, কিন্তু সেদিন কোন উত্তর শোনা গেল না। গোপাল বার বার ডাকতে লাগল, তবু কোন জবাব এল না। তখন অতি করুণ স্বরে গোপাল বলল, 'রাখাল-দাদা, আজ তুমি আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না? তুমি উত্তর না দিলে এঁরা যে মনে করবেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি।'

তখন অতিদূরে বন-প্রদেশ থেকে একটি স্বর ভেসে এল—এক অশরীরী শব্দ, কে যেন বলছে, 'ভাই, তোমার আর তোমার মায়ের ভক্তি-বিশ্বাসের টানেই আমি তোমার কাছে যাই। কিন্তু তোমার গুরুমশায়ের এখনও অনেক দেরী, তাঁকে বল সে-কথা।'

১২. শিষ্যের সাধনা

[১৯০০ খ্রীঃ ২৯ মার্চ সান ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।]

আমার বক্তব্য বিষয়—শিষ্যত্ব। জানি না, আমার বক্তব্য আপনারা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন। আপনাদের পক্ষে এই ভাব গ্রহণ করা কিছু কঠিন হইবে—আমাদের দেশের গুরু-শিষ্যের আদর্শ ও এদেশের গুরু-শিষ্যের আদর্শের মধ্যে অনেক প্রভেদ। ভরতবর্ষের এক প্রাচীন প্রবাদবাক্য আমার মনে পড়িতেছেঃ গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক। এই প্রবাদবাক্যটি সত্য বলিয়াই মনে হয়। আধ্যাত্মিকতা লাভের পথে শিষ্যের মনোভাবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ মনোভাব থাকিলে জ্ঞানলাভ সহজেই ঘটিয়া থাকে।

সত্যলাভ করিতে হইলে শিষ্যের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? জ্ঞানী মহাপুরুষগণ বলেন, এক নিমেষেই সত্যলাভ করা যায়—ইহা তো শুধু জানার ব্যাপার। স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়—ভাঙিতে কতক্ষণ লাগে? এক মুহূর্তেই স্বপ্ন শেষ হইয়া যায়। ভ্রান্তি দূর হইতে কতক্ষণ লাগে? চক্ষের পলক মাত্র। যখন সত্যকে জানিতে পারি, তখন কেবল মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়, আর কিছুই হয় না। রজ্জুকে সর্প ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি—ইহা রজ্জু। সমগ্র ঘটনাটি আধ সেকেণ্ডের ব্যাপার মাত্র। 'তুমি সেই'—তুমিই সত্যস্বরূপ—ইহা জানিতে কতক্ষণ লাগে? যদি আমরা ব্রহ্মই এবং সর্বদাই ব্রহ্মস্বরূপ, তবে ইহা না জানাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য। ইহা জানিতে পারাই তো স্বাভাবিক। আমরা বরাবর কি ছিলাম, বর্তমানেই বা আমাদের স্বরূপ কি, তাহা জানিতে নিশ্চয়ই যুগযুগান্ত লাগিবে না।

তবু এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি উপলব্ধি করা কঠিন বলিয়া মনে হয়। ইহার অতি ক্ষীণ আভাস লাভ করিতেই যুগযুগান্ত কাটিয়া যায়। ঈশ্বরই জীবন; ঈশ্বরই সত্য। এ-বিষয়ে আমরা গ্রন্থ লিখিয়া থাকি; আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা ইহা অনুভব করি যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর সবই মিথ্যা; আজ এ-কথা অনুভব করি, কাল এ-ভাব থাকিবে না, তবু সারাজীবন আমাদের অধিকাংশই পূর্বে যেমন ছিলাম সেইরূপই থাকিয়া যাই। আমরা অসত্যকে

আঁকড়াইয়া থাকি এবং সত্যের প্রতি বিমুখ হই। আমরা সত্যলাভ করিতে চাই না। আমরা চাই না যে, কেহ আমাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া দেয়। তবেই দেখিতেছ, কেহ গুরুর প্রয়োজন বোধ করে না। শিখিতে চায় কে? কিন্তু যদি কেহ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্য উপলব্ধি করিতে চায়, যদি কেহ গুরুর নিকট সত্যলাভ করিতে চায়, তাহাকে খাঁটি শিষ্য হইতেই হইবে।

শিষ্য হওয়া সহজ নয়; তাহার জন্য অনেক প্রস্তুতি প্রয়োজন। অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। বৈদান্তিকগণ চারিটি প্রধান সাধনের কথা বলিয়াছেন। প্রথম সাধন এই—যে-শিষ্য সত্য জানিতে চায়, তাহাকে ইহ-পরজীবনে সমস্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে।

আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনের মধ্যে কোনরূপ বাসনা থাকে, ততক্ষণ যাহা দেখি তাহা সত্য নয়। ঈশ্বরই সত্য, জগৎ সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনে সংসারের জন্য বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সত্য লাভ হইবে না। ‘আমার চারিদিকে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক—আমি ভ্রূক্ষেপ করি না’—পরলোক সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার মনোভাব পোষণ করিতে হইবে; আমি স্বর্গে যাইতে চাই না। স্বর্গ কি?—এই জগতেরই অনুবৃত্তিমাত্র। যদি স্বর্গ না থাকিত—এই অসার পার্থিব জীবনের কোন অনুবৃত্তি যদি না থাকিত, আমরা আরও ভাল হইতাম; যে ক্ষণিকের মিথ্যা স্বপ্নে আমরা মগ্ন, সে-স্বপ্ন আরও শীঘ্র ভাঙিয়া যাইত। স্বর্গে যাইয়া আমরা শুধু আমাদের দুঃখজনক মোহকে দীর্ঘতর করিয়া তুলি।

স্বর্গে যাইয়া কি লাভ হইবে? দেবতা হইয়া অমৃত পান করিবেন, আর বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন। পৃথিবী অপেক্ষা সেখানে দুঃখ যেমন কম, সত্যও তেমনি কম। অতিশয় দরিদ্র অপেক্ষা ধনী ব্যক্তি অনেক কম সত্য বুঝিতে পারে। ‘ধনী ব্যক্তির স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচের ছিদ্র দিয়া উটের যাতায়াত করা বরং সহজ।’১৫ নিজের ধন-ঐশ্বর্য ক্ষমতা সুখ-সুবিধা ও বিলাস-ব্যসন ব্যতীত ধনী ব্যক্তির অন্য কিছু চিন্তা করিবার সময় নাই। ধনী ব্যক্তিরা অতি অল্পই ধার্মিক হয়। কেন? কারণ তাহারা মনে করে, ধার্মিক হইলে তাহাদের জীবনে আর কোন আমোদ-প্রমোদ থাকিবে না। ঠিক তেমনি স্বর্গে ধার্মিক

হইবার আশা খুবই কম। আরাম ও ভোগ সেখানে অত্যন্ত বেশী—স্বর্গের অধিবাসীরা তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক।

অনেকে বলেন, স্বর্গে আর অশ্রুপাত করিতে হইবে না। যে কখনও কাঁদে না, তাহাকে আমি বিশ্বাস করি না। দেহের যেখানে হৃদয় থাকা উচিত, তাহার সেইখানে একটি বৃহৎ কঠিন প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। ইহা তো স্পষ্টই বোঝা যায় যে, স্বর্গবাসীদের বেশী সহানুভূতি নাই। স্বর্গবাসীর সংখ্যা তো অনেক, আর আমরা এই ভয়ানক পৃথিবীতে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা আমাদের টানিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তো ঐরূপ কিছুই করেন না। তাঁহারা কাঁদেন না। স্বর্গে কোন দুঃখ-কষ্ট নাই, সুতরাং তাঁহারা কাহারও দুঃখ গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা অমৃত পান করেন, নৃত্য চলিতে থাকে—সুন্দরী পত্নী লইয়া নানাবিধ সুখে তাঁহাদের দিন কাটে।

এ-সকলের উর্ধ্বে উঠিয়া শিষ্যকে বলিতে হইবে, 'ইহজীবনে আমার কোন কিছুই কাম্য নয়, স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে, সেখানেও আমি যাইতে চাই না। শরীরের সহিত তাদাত্ম্যমূলক কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-জীবন আমি চাই না। বর্তমানে আমার ধারণা—এই বিপুল মাংসস্তূপ দেহটাই আমি। আমি বিশ্বাস করিতে চাই না যে, আমি সত্যই ঐরূপ।'

পৃথিবী ও স্বর্গ ইন্দ্রিয়দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয় না থাকিলে এই পৃথিবীকে তুমি গ্রাহ্যই করিতে না। স্বর্গও একটা জগৎ। পৃথিবীতে স্বর্গে অন্তরীক্ষে যাহা কিছু আছে, সব মিলিয়া একটি নাম—পৃথিবী বা সংসার।

সুতরাং শিষ্য অতীত ও বর্তমানকে জানিয়া, ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিয়া উন্নতি কাহাকে বলে, সুখ কাহাকে বলে—এগুলি সব জানিয়া বুঝিয়া ত্যাগ করিবে এবং একমাত্র সত্যের সন্ধান করিবে। ইহাই প্রথম শর্ত বা সাধন।

দ্বিতীয় সাধন এই যে, শিষ্যকে অবশ্যই অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখিতে সমর্থ হইতে হইবে এবং অন্যান্য অধ্যাত্ম সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত দৃশ্যমান যন্ত্রগুলি বহিরিন্দ্রিয়; অন্তরিন্দ্রিয়গুলি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। বাহিরে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি রহিয়াছে, ভিতরে অনুরূপ অন্তরিন্দ্রিয় রহিয়াছে। আমরা সর্বদা উভয়প্রকার ইন্দ্রিয়গুলির আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির যোগাযোগ রহিয়াছে। যদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি কাছে আসে, ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদিগকে ঐগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। আমাদের নিজস্ব পছন্দ বা স্বাধীনতা নাই। প্রকাণ্ড একটি নাসিকা রহিয়াছে। সামান্য একটু সুগন্ধ আসিতেছে, আমাকে ঐ ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি কোন দুর্গন্ধ আসিত, তবে আমি বলিতাম, 'এই ঘ্রাণ গ্রহণ করিও না'; কিন্তু প্রকৃতি বলিবে 'গ্রহণ কর'। আমি এই ঘ্রাণ গ্রহণ করি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আমরা কি হইয়াছি। আমরা নিজেদের বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। আমার চক্ষু আছ, ভাল-মন্দ যাহা কিছু চক্ষুর সুমুখ দিয়া যাক না কেন, আমাকে দেখিতেই হইবে। শ্রবণযন্ত্রের ব্যাপারটিও এইরূপ। যদি কেহ বিরক্তির সহিত আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে শুনিতেই হইবে। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আমাকে উহা শুনিতে বাধ্য করে এবং শুনিয়া আমি মনে মনে কত কষ্টই না ভোগ করি। নিন্দা বা প্রশংসা যাহাই হউক, মানুষকে শুনিতেই হইবে। এমন বধির লোক আমি অনেক দেখিয়াছি, যাহারা সাধারণতঃ শুনিতে পায় না, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হইলে তাহারা সব শুনিতে পায়।

এই আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়নিচয় সাধক বা শিষ্যের বশে থাকিবে। যে অবস্থায় মন অনায়াসে ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে, স্বভাবের আদেশের বিরুদ্ধে, দাঁড়াতেই পারে, কঠোর অভ্যাসের দ্বারা সাধক শিষ্য সেই অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে। সে নিজের মনকে আদেশ করিতে সমর্থ হইবে, 'তুমি আমার। আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, কোন কিছু দেখিও না বা বলিও না।' তৎক্ষণাৎ মন আর কিছু দেখিবে না বা শুনিবে না। কোন রূপ বা শব্দ মনের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে না। সে-অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির আধিপত্য হইতে মন মুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গুলি হইতে মন বিচ্ছিন্ন। শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির সহিত ইহা আর সংযুক্ত থাকে না। বাহিরের বস্তু-সকল আর এখন মনকে আদেশ করিতে পারে না। মন ঐগুলির সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে। সম্মুখে সুন্দর গন্ধ রহিয়াছে; শিষ্য মনকে বলিল, 'ঐ ঘ্রাণ

গ্রহণ করিও না।' মন আর গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে না। যখন এই স্তরে পৌঁছিয়াছ, তখন জানিবে তুমি ঠিক ঠিক শিষ্য হইতে শুরু করিয়াছ। এইজন্যই যখন কেহ বলে, 'আমি সত্য জানিয়াছি,' তখন আমি বলি, 'যদি সত্য জানিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই তোমার আত্মসংযম হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করিয়া সংযমশক্তির পরিচয় দাও।'

তারপর মনকে শান্ত করিতে হইবে। মন চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। যে মুহূর্তে আমি ধ্যান করিতে বসি, তৎক্ষণাৎ জগতের ঘৃণ্যতম বিষয়গুলি মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমগ্র ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি যেন মনের দাস। মন যতক্ষণ চঞ্চল এবং আয়ত্তের বাহিরে, ততক্ষণ কোনরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্ভব নয়। শিষ্যকে মনঃসংযম শিক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য মনের কার্যই চিন্তা করা। কিন্তু শিষ্যের অনভিপ্রেত হইলে মন নিশ্চয়ই চিন্তা করিবে না; যখনই সে আদেশ করিবে, তখনই মনকে চিন্তা বন্ধ করিতে হইবে। উপযুক্ত শিষ্য হইতে গেলে মনের এরূপ অবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সহিষ্ণুতার প্রচণ্ড শক্তিও শিষ্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যখন চারিপাশে সব কিছুই ভাল চলে, তখন জীবন বেশ আরামপ্রদ বোধ হয়, মনও ভাল থাকে। কিন্তু অপ্রীতিকর কিছু ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে মনের স্থৈর্য নষ্ট হইয়া যায়। উহা ভাল নয়। সকল দুঃখকষ্ট বিনা অভিযোগে, এতটুকু দুঃখী না হইয়া, এতটুকু প্রতিরোধ প্রতিশোধ বা প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া সহ্য কর। ইহাই যথার্থ সহিষ্ণুতা। ইহাই তোমাকে অর্জন করিতে হইবে।

পৃথিবীতে ভাল ও মন্দ চিরকালই আছে। মন্দটির অস্তিত্ব অনেকে ভুলিয়া যায়—অন্ততঃ ভুলিবার চেষ্টা করে; যখন মন্দ আসে, তখন তাহারা উহা দ্বারা সহজে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বিরক্তি বোধ করে। আবার কেহ কেহ কোনরূপ মন্দের অস্তিত্বই স্বীকার করে না এবং সব কিছুকেই ভাল বলিয়া মনে করে। উহাও একটি দুর্বলতা, উহাও মন্দ জিনিষের প্রতি ভীতি হইতে সঞ্জাত। যদি কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য থাকে, গোলাপ-জল ছিটাইয়া তাহাকে সুগন্ধ বলা কেন? হ্যাঁ, জগতে ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। ভগবান্ মন্দ জিনিষ জগতে রাখিয়াছেন। কিন্তু তোমাকে তাহার উপর চুনকাম করিতে হইবে না। কেন মন্দ

রহিয়াছে, সে-সম্বন্ধে তোমার মাথা-ঘামানো প্রয়োজন নাই। ভগবানে বিশ্বাস রাখো এবং চুপ করিয়া থাক।

আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে জনৈক ব্রাহ্মণ রোগমুক্তির জন্য তাঁহাকে তাঁহার প্রবল মনঃশক্তি প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিল। তাহার মতে—আচার্যদেব যদি দেহের রোগাক্রান্ত অংশটির উপর তাঁহার মন একাগ্র করেন,—তবে অসুখ সারিয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, ‘কি! যে- মন ঈশ্বরকে দিয়াছি, সেই মন এই তুচ্ছ শরীরে নামাইয়া আনিব?’ দেহ এবং রোগের কথা তিনি ভাবিতে চাহিলেন না। তাঁহার মন সর্বদা ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া থাকিত। সে-মন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি এই মন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে রাজী ছিলেন না।

স্বাস্থ্য, সম্পদ, দীর্ঘজীবন প্রভৃতি তথাকথিত ভাল ভাল জিনিষের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা—মায়া বা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। এগুলি পাইবার জন্য মনোনিবেশ করিলে ভ্রম দৃঢ় করা হয়। ইহজীবনে আমাদের এ-সকল স্বপ্ন ও মায়া আছে, এবং পরলোকে—স্বর্গে যাইয়া আমরা এগুলি আরও বেশী পরিমাণে পাইতে চাই। মায়া বাড়িয়া যায়। মন্দের প্রতিরোধ করিও না; তাহার সম্মুখীন হও। তুমি মন্দ বা অশুভ অপেক্ষা অনেক বড়।

জগতে এই দুঃখ আছে, একজনকে তো তাহা ভোগ করিতে হইবেই। কাহারও অনিষ্ট না করিয়া তুমি কোন কাজ করিতে পার না। আর যখন তুমি পার্থিব শুভ কামনা কর, তখন শুধু আর একটি অশুভই এড়াইয়া যাও। সেই অশুভ অপর কাহাকেও ভোগ করিতে হইবে। মন্দটি সকলেই অন্যের ঘাড়ে চাপাইতে চায়। সাধক বলিবে, ‘জগতের সকল দুঃখ আমার নিকটে আসিতে দাও। আমি এগুলি সহ্য করিব। অপরকে মুক্ত হইতে দাও।’

ক্রুশবিদ্ধ মহামানবকে স্মরণ কর। জয়লাভ করিবার জন্য তিনি অসংখ্য দেবদূত আনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রতিরোধ করিলেন না। যাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল, তাহাদিগকে তিনি করুণা করিলেন। তিনি সকল দুঃখকষ্ট ও অপমান সহ্য করিলেন। সকলের ভার তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। ‘তোমরা যাহারা অতিশয় দুঃখ

ভারাক্রান্ত, তাহারা আমার নিকটে আইস। আমি তোমাদের দুঃখ দূর করিব এবং শান্তি দিব।'১৬ ইহাই যথার্থ সহনশীলতা। তিনি এই জীবনে কত ঊর্ধ্বে ছিলেন—এত ঊর্ধ্বে যে, আমরা ক্রীতদাসগণ তাহা ধারণাও করিতে পারি না! আমার গালে কেহ চড় মারিলেই আমার হাত সশব্দে আর একটি চড় মারিয়া দেয়! আমি কিরূপে সেই মহিমময় পুরুষের মহত্ত্ব ও চিত্তের প্রশান্তি ধারণা করিতে পারি? তাঁহার মহিমা আমি কি বুঝিব?

কিন্তু আদর্শকে আমি নীচে নামাইয়া আনিব না। আমি অনুভব করি, আমি দেহ; আমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করি। আমার মাথা ধরিলে তাহা সারাইবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াই, দুই হাজার শিশি ঔষধ খাই। কেমন করিয়া আমি এ-সকল অপূর্ব চরিত্র বুঝিতে পারিব? আদর্শ আমি দেখিতে পারি—কিন্তু আদর্শের কতটুকু? এই দেহের কোন চেতনা, কোন তুচ্ছ অহং-ভাব, কোন আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে না। সর্বদা শুধু চৈতন্যবিষয়ক চিন্তা করিয়া এবং মনকে জড়বস্তুর ঊর্ধ্বে রাখিয়া আমি সেই আদর্শের আভাসমাত্র পাইতে পারি। জড়বস্তুর চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়-জগতের রীতিনীতির কোন স্থান সেই আদর্শে নাই। ঐগুলি হইতে মন তুলিয়া আত্মায় সমাহিত কর। তোমার জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, নাম ও যশ সব ভুলিয়া যাও এবং অনুভব কর—তুমি শরীর বা মন নও, তুমি শুদ্ধ আত্মা।

আমি যখন 'আমি' বলি, তখন এই চৈতন্য বা আত্মাকেই বুঝি। যখন তুমি নিজের 'আমি' সম্বন্ধে চিন্তা কর, তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখ—কোন্ ছবি ফুটিয়া উঠে। তোমার দেহচিত্র কি মনে জাগিতেছে? অথবা মনের প্রকৃতি? যদি তাই হয়, তবে তুমি এখনও সত্য 'আমি'কে জানিতে পার নাই। এমন সময় আসিবে, যখন 'আমি' বলিতে বলিতে সমগ্র জগৎ—সেই অনন্ত সত্তা উদ্ভাসিত দেখিতে পাইবে। তখন তুমি নিজের সত্য স্বরূপকে দেখিতে পাইবে এবং নিজের অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করিবে। তুমি চৈতন্যময়, তুমি জড়পদার্থ নও—ইহাই সত্য। ভ্রম বলিয়া একটি অনুভূতি আছে—এক বস্তুকে আর এক বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়—জড়কে চৈতন্য এবং চৈতন্যকে জড় বলিয়া মনে হয়। ইহাই প্রচণ্ড ভ্রম। ইহা দূর করিতে হইবে।

গুরুর প্রতি শিষ্যকে শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে—ইহাই পরবর্তী সাধনা। পাশ্চাত্য গুরু শিষ্যকে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। গুরুর সহিত শিষ্যের সম্পর্ক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। গুরু আমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয়, তারপর মাতা, তারপর পিতা। গুরুর প্রতিই আমার শ্রদ্ধা সর্বপ্রথমে নিবেদিত। যদি পিতা বলেন, 'ইহা কর' এবং গুরু বলেন, 'ইহা করিও না'—আমি তাহা করি না। গুরু আমার আত্মার মুক্তিসাধন করেন। পিতামাতা আমায় শরীর দিয়াছেন, কিন্তু গুরু আমাকে আত্মার মধ্যে নবজন্ম দান করিয়াছেন।

আমাদের কতকগুলি অদ্ভুত বিশ্বাস আছে। একটি এই—অতি অল্প কয়েকটি অসাধারণ আত্মা আছেন, যাঁহারা নিত্যমুক্ত এবং যাঁহারা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা মুক্তই আছেন; নিজেদের মুক্তির জন্য তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না, অপরকে সাহায্য করিতে চান। তাঁহাদের কিছু শিখিবার প্রয়োজন নাই। শৈশব হইতে তাঁহারা সব জানেন। ছয়মাসের শিশু হইয়াও তাঁহারা পরমসত্যের বাণী বলিতে পারেন।

এই মুক্তাত্মাদের উপরেই মনুষ্যজাতির উন্নতি নির্ভর করে। তাঁহারা যেন প্রথম প্রজ্বলিত দীপের ন্যায়—এই দীপটি হইতে অপর দীপগুলি জ্বলিয়া উঠে। ইহা সত্য যে, সকলের অন্তরের আলোক রহিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির অন্তরেই ইহা প্রচ্ছন্ন। মহাপুরুষগণ প্রথম হইতেই এই আলোকে ভাস্বর। যাহারা তাঁহাদের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের হৃদয়দীপও যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা দ্বারা প্রথম দীপটির কোন ক্ষতি হয় না, প্রথম দীপটি অপর দীপগুলিতে আলোক সঞ্চার করে। কোটি কোটি দীপ প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু প্রথম দীপটি পূর্বের মতই অনির্বাণ তেজে জ্বলিতে থাকে। প্রথম দীপটি গুরু। যে দীপটি এই প্রথম দীপের শিখা হইতে প্রজ্বলিত হয়, সে শিষ্য। ক্রমে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও গুরু হন—এই ভাবে চলিতে থাকে। যাঁহাদের আপনারা অবতারপুরুষ বলিয়া থাকেন, সেই মহাপুরুষগণ বিপুল অধ্যাত্মশক্তির আধার। তাঁহারা সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে ঐ শক্তি সঞ্চার করেন এবং শিষ্য-পরম্পরা এক বিরাট অধ্যাত্মশক্তির প্রবাহ প্রবর্তন করেন।

খ্রীষ্টান বিশপ হস্তদ্বারা কাহারও মস্তক স্পর্শ করিয়া নিজে পূর্বগ বিশপের নিকট যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। বিশপ বলেন, যীশু

তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, শিষ্যগণ আবার অপরের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করেন। এইভাবেই পরম্পরাক্রমে খ্রীষ্টের শক্তি তাঁহার নিকট আসিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, শুধু বিশপগণ নন, আমাদের প্রত্যেককেই সেই শক্তি লাভ করিতে হইবে। আপনারা প্রত্যেকেই সেই প্রচণ্ড অধ্যাত্মশক্তির আধার হইতে পারেন। কেন হইতে পারিবেন না? না হইবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু প্রথমে আপনাকে একজন গুরু—যথার্থ গুরু খুঁজিয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি সামান্য মানব মাত্র নন। আপনি একজন দেহধারী গুরু লাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত গুরু দেহের মধ্যে নাই। চোখে যেমন দেখিতেছেন, গুরু সেইরূপ দেহধারী মানুষ নন। গুরু আপনার নিকট মানবরূপে আসিতে পারেন এবং আপনি তাঁহার নিকট শক্তিলাভও করিতে পারেন। কখনও কখনও তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। গুরুর শক্তি আমাদের নিকট নানাভাবে আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্য—মর্ত্য মানবের জন্য গুরু অবশ্যই আসিবেন। তাঁহার আবির্ভাব-ক্ষণ অবধি আমাদের প্রস্তুতি চলিবে।

আমরা বক্তৃতা শুনি, পুস্তক পড়ি, ঈশ্বর আত্মা ধর্ম ও মুক্তি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করি। এগুলি আধ্যাত্মিকতা নয়, কারণ আধ্যাত্মিকতা পুস্তকে দর্শনে বা মতবাদে নাই। ইহা বিদ্যা বা বিচারে নাই, অন্তরের প্রকৃত বিকাশে নিহিত। তোতাপাখিও বুলি মনে রাখিয়া আওড়াতেই পারে। যদি আপনি বিদ্বান্ হইয়া থাকেন, তাহাতে কি আসে যায়? গর্দভেরা সমগ্র গ্রন্থাগারটি পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং যখন যথার্থ আলোক আসিবে, তখন পুঁথিগত বিদ্যার আর প্রয়োজন হইবে না। নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে অক্ষম ব্যক্তিও ধার্মিক হইতে পারেন, আবার পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারের জ্ঞানরাশি যাঁহার মস্তকে পুঞ্জীভূত আছে, তিনিও পারেন না। আধ্যাত্মিক উন্নতি পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা রাখে না। পাণ্ডিত্যের উপর আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করে না। গুরুর স্পর্শ—শক্তি-সঞ্চার দ্বারা আপনার হৃদয় জাগ্রত হইবে। তারপরই আধ্যাত্মিক উন্নতির আরম্ভ। উহাই যথার্থ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। আর থামিতে হইবে না, আপনি ক্রমেই অগ্রসর হইবেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমার এক বন্ধু খ্রীষ্টান ধর্মযাজক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি কি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী?’ আমি উত্তর দিলাম, ‘হ্যাঁ, বোধ হয় একটু অধিক শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাসী?’ ‘তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হও না কেন?’ ‘কেমন করিয়া দীক্ষিত হইব? কাহার দ্বারা?’ যথার্থ দীক্ষাদাতা কোথায়? দীক্ষা কি? ইহা কি কতকগুলি বাঁধা-ধরা মন্ত্র আওড়াইয়া জল ছিটান, না জোর করিয়া ধরিয়া জলে ডুবান?

দীক্ষা হইতেছে সাক্ষাৎভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ। যথার্থ দীক্ষালাভ করিলে জানিবেন—আপনি দেহ নন, আপনি আত্মা। যদি পারেন, তবে সেই দীক্ষা আমায় দিন; যদি তাহা না পারেন, তবে তো আপনারাই খ্রীষ্টান নন। তথাকথিত দীক্ষালাভের পরেও আপনারা তো পূর্বের মতই রহিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের নামে আপনারা দীক্ষিত হইয়াছেন—এ-কথা বলার অর্থ কি? শুধু কথা আর কথা—আর জগৎকে নিজ নিজ মূর্খতার দ্বারা বিরক্ত করিয়া তোলা! ‘অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও নিজেদের জ্ঞানী ও বিদ্বান্ মনে করিয়া মূর্খেরা অন্ধচালিত অন্ধের ন্যায় যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।’১৭ সুতরাং এ-কথা বলিবেন না যে, আপনারা খ্রীষ্টান; আর দীক্ষা (Baptism) প্রভৃতির মত তত্ত্ব লইয়া বাগাড়ম্বর করিবেন না।

অবশ্য যথার্থ দীক্ষা আছে, জগতে আসিয়া যীশু যখন প্রথম তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তখন দীক্ষা ছিল। যুগে যুগে যে-সকল মুক্তাত্মা মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, আমাদের নিকট অতীন্দ্রিয় জ্ঞান প্রকাশ করিবার শক্তি তাঁহাদের আছে। ইহাই যথার্থ দীক্ষা। আপনারা দেখিতেছেন, প্রত্যেক ধর্মের বিধি ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত হইবার পূর্বেই সর্বজনীন সত্যের বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। কালক্রমে এই সত্য লোকে ভুলিয়া যায়; বাহ্য অনুষ্ঠানাদি যেন ইহার শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে। বাহিরের পদ্ধতিগুলি বজায় থাকে, কিন্তু ভিতরের ভাবটি চলিয়া যায়। শুধু বাহিরের আধারটি আমরা দেখিতে পাই। দীক্ষার বাহ্য রূপটি আছে।

কিন্তু অতি অল্প ব্যক্তিই ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। বাহ্য আচারই যথেষ্ট নয়। আমরা যদি প্রত্যক্ষ সত্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে ঐ বিষয়ে যথার্থভাবে দীক্ষিত হইতে হইবে। ইহাই আদর্শ।

গুরু আমাকে অবশ্যই শিক্ষাদান করিয়া আলোকের পথে পরিচালিত করিবেন এবং যে গুরুশিষ্য-পরম্পরার তিনি নিজে একটি যোগসূত্র, আমাকেও তাহার যোগসূত্র করিয়া লইবেন। যে-কোন লোক নিজেকে গুরু বলিয়া দাবী করিতে পারে না। গুরু হইবেন তিনি, যিনি সেই পারমার্থিক সত্য জানিয়াছেন—প্রত্যক্ষ করিযাছেন, যিনি নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। শুধু কথা বলিলেই কেহ গুরু হইতে পারে না। আমার মত বাক্যবাগীশ মূর্খ অনেক কথা বলিতে পারে, কিন্তু গুরু হইতে পারে না। যথার্থ গুরু শিষ্যকে বলিবেন, 'যাও, আর পাপ করিও না'—সে আর পাপ করিতেই পারে না। তাহার আর পাপ করিবার শক্তিই থাকে না।

আমি এই জীবনে এরূপ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্র আমি পড়িয়াছি। এগুলি অপূর্ব। কিন্তু পুস্তকে সেই প্রাণবন্ত শক্তির সাক্ষাৎ পাইবেন না, যে-শক্তি মুহূর্তে জীবন পরিবর্তন করিতে পারে, তাহা শুধু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; জ্ঞানের উজ্জ্বল বিগ্রহ এই মহাপুরুষগণ মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন। তাঁহারাই গুরু হইবার উপযুক্ত। তুমি আমি কেবল বৃথা বচনবাগীশ, গুরু বা আচার্য নই; শুধু কথার কোলাহলে জগৎকে বিব্রত করিতেছি, চিন্তাজগতে অশুভ কম্পনের সৃষ্টি করিতেছি। আশা, প্রার্থনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হই, একদিন আমরা সত্যে উপনীত হইব, তখন আর আমাদের কথা বলিতে হইবে না।

'গুরুর বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ; তিনি অশীতিপর বৃদ্ধকে শিক্ষা দিতেছেন। গুরুর শিক্ষাপদ্ধতি নীরবতা আর শিষ্যের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইতেছে।'১৮ ইহাই গুরুর বর্ণনা। ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ এক ব্যক্তিকে পাইলে তাঁহার প্রতি আপনার কিরূপ বিশ্বাস ও ভালবাসা হইবে। কারণ তিনি স্বয়ং ভগবান্ অপেক্ষা কিছু কম নন! এ জন্যই খ্রীষ্টের শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন। শিষ্য গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে। যতক্ষণ না মানুষ

ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ সে ভগবানের যতটুকু জানিতে পারে, তাহা এই মানবদেহধারী নরদেবতারূপেই জানিতে পারে। আর অন্য কী ভাবে সে ভগবানকে জানিতে পারে?

এখানে আমেরিকায় একজন ব্যক্তি—খ্রীষ্টজন্মের উনিশ-শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, খ্রীষ্ট যে জাতিতে জন্মিয়াছিলেন, সে সেই য়াহুদীজাতিসম্ভূতও নয়, সে যীশু অথবা তাঁহার পরিবারবর্গকে দেখে নাই। সে বলে, 'যীশু ছিলেন ভগবান্। যদি বিশ্বাস না কর, তবে নরকে যাইবে।' আমরা বুঝিতে পারি, যীশুর শিষ্যগণ কিভাবে বিশ্বাস করিতেন, খ্রীষ্ট ভগবান্। তিনি তাঁহাদের গুরু ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যীশুকে অবশ্যই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। উনিশ-শত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত মানুষটিকে লইয়া এই আমেরিকান কি করিবে? এই যুবকটি আমায় বলিতেছে, যীশুকে আমি বিশ্বাস করি না, অতএব আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যীশু সম্বন্ধে সে কি জানে? সে পাগলা-গারদে থাকিবার উপযুক্ত। এরূপ বিশ্বাস চলিবে না। তাহাকে তাহার গুরু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

যীশু আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, আপনার নিকট আসিতে পারেন। তখন যদি আপনি তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন, ভাল কথা। গুরুর আবির্ভাব অবধি আমরা অবশ্যই প্রতীক্ষা করিব এবং গুরুকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা করিতে হইবে। তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বর অপেক্ষা কিছু কম নন। গুরুকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, ক্রমে তিনি লীন হইয়া যাইতেছেন। পরে কি থাকে? গুরুমূর্তি ভগবানের জন্য আসন ছাড়িয়া দেন। আমাদের নিকট আসিবার জন্য ভগবান্ গুরুর জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরিয়া থাকেন। স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে এই মূর্তির আবরণ ক্রমশঃ খসিয়া যায়, ভগবান্ প্রকাশিত হন।

'আমি গুরুকে প্রণাম করি, যিনি ব্রহ্মানন্দের মূর্ত বিগ্রহ, পরমসুখদ ও পরমজ্ঞানের প্রতিমূর্তি, যিনি পবিত্র পূর্ণ অদ্বিতীয় অনন্ত সুখ-দুঃখের অতীত অচিন্ত্য ভাবাতীত ও ত্রিগুণরহিত'।১৯ ইনিই প্রকৃত গুরু। শিষ্য যে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করিবে, তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, এবং সন্দেহাতীত ভাবে অনুসরণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। গুরু-শিষ্যের মধ্যে ইহাই সম্বন্ধ।

মুক্তিলাভের জন্য শিষ্যকে প্রবল আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে—ইহাই পরবর্তী সাধন। ইন্দ্রিয়নিচয় আমাদিগকে কেবল দগ্ধ করে, বাসনা বৃদ্ধি করে—ইহা জানিয়াও পতঙ্গের ন্যায় আমরা অগ্নিশিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেছি। 'উপভোগের দ্বারা বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না। ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ভোগের দ্বারা ভোগ বাড়িয়াই চলে।২০ বাসনা দ্বারা বাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা জানিয়াও মানুষ সর্বদাই ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। জন্ম জন্ম ধরিয়া তাহারা ভোগ্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে এবং ফলে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিতেছে, তথাপি বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না। যে-ধর্ম তাহাদিগকে এই ভীষণ বাসনার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে, তাহাকেও তাহারা বাসনা-পরিতৃপ্তির উপায় করিয়া তুলিয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন এবং বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহারা ক্বচিৎ কখনও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। তৎপরিবর্তে তাহারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের জন্য প্রার্থনা করে, 'হে ঈশ্বর! আমার মাথার বেদনা সারাইয়া দাও। আমায় কিছু টাকাকড়ি বা অন্য কিছু দাও।'

দৃষ্টির পরিধি এত সঙ্কীর্ণ, এত নীচু, এত পশুবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কেহই এই দেহের ঊর্ধ্বে কিছু চাহিতেছে না। হায়, কি ভয়ঙ্কর অবনতি! কি ভায়ানক দুর্দশা! এই মাংসপিণ্ড, পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর উদর! শিশ্ন ও উদরের সমাবেশ ছাড়া জগৎটা আর কি? কোটি কোটি নরনারীর পানে চাহিয়া দেখ—তাহারা এইজন্যই জীবনধারণ করিয়া আছে। তাহাদের নিকট হইতে এই বস্তু-দুইটি সরাইয়া লও, তাহারা মনে করিবে জীবন শূন্য অর্থহীন ও অসহনীয়। আমরা এইরূপ, আর আমাদের মনও এইরূপ। এই মন সর্বদা ক্ষুধা ও কাম চরিতার্থ করিবার পথ ও উপায় খুঁজিতেছে। সর্বদাই এইরূপ চলিতেছে। দুঃখকষ্টও তেমনি অনন্ত। দেহের এই সকল তৃষ্ণা শুধু ক্ষণিক তৃপ্তি এবং অশেষ দুঃখের কারণ হয়। এ যেন পয়োমুখ বিষকুম্ভের অবস্থা। কিন্তু তথাপি আমরা এগুলির জন্য লালায়িত হই।

কি করা যায়? ইন্দ্রিয়-দমন এবং বাসনা-ত্যাগই এই দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা প্রকৃত পরীক্ষা। এই নিরর্থক ইন্দ্রিয়সর্বস্ব সংসার বর্জন কর। যথার্থ বাসনা মাত্র একটি আছেঃ সত্যোপলব্ধির

বাসনা—অধ্যাত্মজীবনলাভের বাসনা। জড়বাদ বা অহংসর্বস্বতা আর নয়। আমাকে আধ্যাত্মিক হইতে হইবে। দৃঢ় ও তীব্র ইচ্ছা চাই। কোন ব্যক্তির হাত-পা বাঁধিয়া তাহার শরীরে এক-টুকরা জ্বলন্ত কয়লা রাখিয়া দিলে সে উহা ফেলিয়া দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করে। যদি এই জ্বলন্ত সংসারকে দূরে সরাইয়া ফেলিতে আমার সেইরূপ তীব্র ইচ্ছা ও অবিরাম চেষ্টা চলিতে থাকে, তবেই পরম সত্যের আভাস লাভ করিবার সময় উপস্থিত হইবে।

আমাকে লক্ষ্য করুন। দুই-তিনটি ডলার সহ আমার ছোট পকেট বইটি হারাইয়া গেলে ঘরের মধ্যে বিশবার খুঁজিয়া বেড়াই। কত উদ্বেগ, কত দুশ্চিন্তা, কত চেষ্টা! যদি আপনাদের কেহ আমাকে কোন বাধা দেন, তবে কুড়ি বৎসর উহা আমার মনে থাকে, সেই ঘটনাটি ক্ষমা করিতে বা ভুলিয়া যাইতে পারি না। ইন্দ্রিয়ের অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলির জন্য আমি ঐরূপ চেষ্টা করিতে পারি। ভগবানের জন্য কে এইরূপ চেষ্টা করে? 'ক্রীড়ারত শিশু সব কিছুই ভুলিয়া থাকে। যুবকগণ ইন্দ্রিয়সম্ভোগের জন্য উন্মত্ত; তাহারা অন্য কিছুর চিন্তা করে না। প্রাচীনেরা তাহাদের অতীত দুষ্কর্মের চিন্তায় মগ্ন।'২১ বৃদ্ধেরা আয় উপভোগ করিতে পারে না, তাহারা অতীতে যাহা ভোগ করিয়াছিল, তাহার কথাই ভাবিতেছে। জাবর কাটিতেই বৃদ্ধেরা খুব দক্ষ। বিষয়ভোগের জন্য মানুষ যেভাবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে, ভগবানের জন্য কেহই তেমন করে না।

সকলেই বলিয়া থাকে ঈশ্বর সত্য-স্বরূপ, একমাত্র নিত্য বস্তু, আত্মাই আছে, জড় নাই। তথাপি ভগবানের নিকট তাহারা যে-যে বিষয়ে প্রার্থনা করে, সেগুলি কদাচিৎ আত্মবিষয়ক। তাহারা সর্বদাই জড়বস্তু চায়। তাহাদের প্রার্থনায় জড়বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক্ করা হয় না। ধর্মের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে! সমগ্র ব্যাপারটিই মেকী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেলেও কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হইতেছে না। মানুষ শুধু একটি জিনিষের জন্যই আকাঙ্ক্ষা করিবে—আত্মার জন্য, কারণ একমাত্র আত্মাই আছে। ইহাই আদর্শ। যদি আপনি এখনই ইহা লাভ করিতে না পারেন, তবে বলুন, 'আমি ইহা লাভ করিতে পারিতেছি না; আমি জানি ইহাই আদর্শ, কিন্তু এখনও

অনুসরণ করিতে পারিতেছি না।' কিন্তু আপনি তো তাহা করেন না। ধর্মকে আপনারা নিম্নস্তরে নামাইয়া আনিয়া আত্মার নামে জড়বস্তু খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আপনারা সকলেই নাস্তিক, ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। 'অমুক ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছিল—ইহার মধ্যে কিছু থাকিতে পারে। এস, চেষ্টা করি আর মজা দেখি। হয়তো কোন উপকার হইবে; হয়তো আমার ভাঙা পা-খানি জোড়া লাগিয়া যাইবে।'

রুগ্নব্যক্তিরা বড় দুঃখী, তাহারা ঈশ্বরের পরম উপাসক, কারণ তাহাদের ধারণা—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিয়া দিবেন। যদি এই প্রার্থনা আন্তরিক হয় এবং যদি তাহারা মনে রাখে যে, এই প্রার্থনা ধর্ম নয়, তবে এরূপ প্রার্থনা যে একেবারে মন্দ, তাহা নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'চার প্রকার লোক আমাকে ভজনা করে—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, ও জ্ঞানী।'২২ আর্ত মানুষ দুঃখমোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। অসুস্থ হইলে তাহারা আরোগ্য-কামনায় পূজা করে; সম্পদ হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে। আবার অনেকের মন কামনায় পূর্ণ বলিয়া ভগবানের নিকট নাম, যশ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রার্থনা করে। তাহাদের প্রার্থনা এইরূপঃ 'হে মাতা মেরী! আমি যাহা চাই, তাহা পাইলে তোমার পূজা দিব। তুমি যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবে আমি ঈশ্বরের পূজা করিব এবং তোমাকে সব কিছুর অংশ দিব।' যাহারা অতটা জড়বাদী নয়, অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসীও নয়—এমন লোকেরা তাঁহাকে জানিতে চায়। তাহারা তত্ত্বান্বেষী। তাহারা দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে, বক্তৃতাদি শ্রবণ করে, তাহারা জিজ্ঞাসু। যাহারা ভগবানের আরাধনা করে এবং তাঁহাকে জানিতে পারে—তাহারা সর্বশেষ শ্রেণীর সাধক। এই চারি স্তরের সাধকই ভাল—কেহই মন্দ নয়। তাহারা সকলেই ঈশ্বরের আরাধনা করে।

কিন্তু আমরা শিষ্য হইবার সাধনা করিতেছি। আমাদের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হইবে পরমসত্যকে জানা, আমাদের লক্ষ্য উচ্চতম। 'পরিপূর্ণ উপলব্ধি' প্রভৃতি বড় বড় কথা আমরা বলিয়াছি। কথা অনুযায়ী কাজ করা চাই। আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসুন আমরা আত্মার উপাসনা করি। আমাদের সাধনার ভিত্তি, সাধনার পথ ও চরম ফল সবই হউক চৈতন্যময়। কোথাও

জড়-জগৎ থাকিবে না। জগৎ চলিয়া যাক্, মহাশূন্যে ঘুরিতে থাকুক—কে ইহা গ্রাহ্য করে? আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হউন। উহাই লক্ষ্য। আমরা জানি, এখনও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারি নাই। কিছুই আসে যায় না; হতাশ হইবেন না। হতাশ হইয়া আদর্শকে নীচে নামাইয়া আনিবেন না। প্রয়োজনীয় কথা এইঃ নিজেকে আপনি কতটা কম এই প্রাণহীন জড়দেহ বলিয়া ভাবিতেছেন, আর কতটাই বা জ্যোতির্ময় অমর আত্মা বলিয়া চিন্তা করিতেছেন। যতই নিজেকে জ্যোতির্ময় অমর আত্মারূপে চিন্তা করিবেন, ততই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইবেন। ইহাই তীব্র মুমুক্ষুত্ব।

শিষ্য হইবার চতুর্থ এবং সর্বশেষ সাধন—নিত্যানিত্য-বিচার। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু। সদাসর্বদা মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে, নিবেদিত থাকিবে। ঈশ্বরই আছেন, আর কিছুই নাই; আর সব কিছু আসে এবং চলিয়া যায়। এই সংসারের জন্য কোনরূপ বাসনাই ভ্রম, কারণ এ সংসার অনিত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সব কিছু অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, ততক্ষণ একমাত্র ঈশ্বরসম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে—মনকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

যিনি শিষ্য হইতে চান, তাঁহাকে এই সকল শর্ত পূর্ণ করিতে হইবে। নচেৎ তিনি প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্যে আসিতে পারিবেন না। আর যদি সৌভাগ্যবশতঃ গুরুলাভও হয়, তথাপি গুরু যে আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁহার মধ্যে সঞ্চার করিবেন, তাহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবেন না। এ-সকল সাধনার মধ্যে কোন আপস চলিবে না। এই শর্তগুলি পূর্ণ করিলে এবং এইরূপ প্রস্তুতি থাকিলে শিষ্যের হৃদয়কমল বিকশিত হইয়া উঠিবে, তখনই মৌমাছি আসিবে। শিষ্য তখন জানিতে পারিবেন যে, গুরু তাঁহার দেহের মধ্যেই, তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলেই বিরাজিত ছিলেন। তখনই তিনি বিকশিত হইয়া উঠেন, তখনই তিনি উপলব্ধি করেন। সংসার-সমুদ্র পার হইয়া তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া যান। এ ভয়ঙ্কর সাগর তিনি পার হইয়াছেন; কোন লাভ বা প্রশংসার কথা না চিন্তা করিয়া করুণাবশতঃ তিনি তখন অপরকেও সংসার-সাগরের পারে যাইতে সাহায্য করেন।

১৩. গুরুর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর

স্বামীজী বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেনঃ ব্যবসায়িসুলভ হিসেবী মনোভাব ছাড়ো—সামান্য একটি জিনিষের প্রতি যে-আসক্তি আছে, তা ছাড়তে পারলে বুঝব, মুক্তির পথে পা বাড়িয়েছ। আমি তো কোন পতিতা, পাপী বা সাধু দেখিতে পাচ্ছিনে। যাকে পতিতা বলছ, সেও তো মহামায়াই। সন্ন্যাসীরা একবার বা দুবার তাকে 'মা' বলে আহ্বান করে, তারপর আবার তাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়, তারা বলে, 'হে অসতী পতিতা নারী, দূরে সরে যাও'। একমুহূর্তেই সকল অজ্ঞানতা দূর হতে পারে—অজ্ঞানতা ধীরে ধীরে দূর হয় বলা মূর্খতামাত্র। বহু গুরু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরেও শিষ্য তাঁর প্রতি অনুগত থাকে—দেখা গিয়েছে। রাজপুতানায় দেখেছি, জনৈক ভক্তের গুরু খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও শিষ্য তাঁকে নিয়মিতভাবে পূর্বের মত সাহায্য দিত, সাহায্য বন্ধ করেনি। তোমরা পাশ্চাত্য ধারণা ছাড়। কোন বিশেষ গুরুর উপরে তোমরা যখন তোমাদের সকল বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছ, তখন সকল শক্তি দিয়ে তাঁকেই ধরে থাক।

একমাত্র বালকেরাই বলে থাকে যে, বেদান্তের মধ্যে কোন নৈতিকতা নেই। তাদের কথা ঠিকই—কারণ বেদান্ত নৈতিকতার ঊর্ধ্বে। তোমরা সন্ন্যাসী হয়েছ, উচ্চ চিন্ত ও আলোচনা কর।

তোমাদের জোর করে অন্ততঃ একটি বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি আনতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে চিন্তা করা অনেক সহজ। কিন্তু বিপদ হল এই—আমরা মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি আনতে পারি না। ঈশ্বর তো নিরাকার, নিত্য, সর্বত্র বিরাজিত।

তাঁকে সাকার বলে চিন্তা করা মহাপাপ, ঐরূপ চিন্তা করলে ঈশ্বর-নিন্দা করা হয়। কিন্তু সাকার উপাসনার মূলকথা এই যে, ঐ প্রকার উপাসনার মাধ্যমে উপাসক ভগবদ্বিষয়ে ধারণার উৎকর্ষ লাভ করে।

১৪. মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্য

মন্ত্রবাদের সমর্থকদের বিশ্বাস—কতকগুলি শব্দ গুরু বা শিষ্যপরম্পরায় চলে এসেছে। এই-সকল শব্দের বার বার উচ্চারণে বা জপে একপ্রকার উপলব্ধি হয়। ‘মন্ত্রচৈতন্য’ শব্দের দু-রকম অর্ত করা হয়। এক মতে—মন্ত্র জপ করতে করতে জাপকের সামনে তার ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হয়। ‘ইষ্ট’ হচ্ছেন মন্ত্রের বিষয় বা মন্ত্রের দেবতা। আর একটি মত এইঃ যে-গুরুর উপযুক্ত শক্তি নেই, তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলে—সেই মন্ত্রে চেতনা সঞ্চার করতে হলে দীক্ষিতকে কতগুলি অনুষ্ঠান২৫ করতে হয়, তখন সেই মন্ত্রজপের ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন মন্ত্রে চেতনা সঞ্চারিত হলে তার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। একটি সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে—বহুক্ষণ জপ করলেও জপকারী কোন রকম অস্বস্তি বোধ করে না এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার মনঃসংযোগ হয়। এ হচ্ছে তান্ত্রিক মন্ত্রের কথা।

বৈদিক যুগ থেকেই মন্ত্র সম্পর্কে এই দুটি মত চলে আসছে। যাস্ক ও অন্যান্যের অভিমত এই—বেদমন্ত্রের অর্থ আছে। কিন্তু প্রাচীন মন্ত্রশাস্ত্রীরা বলেনঃ এগুলির কোন অর্থই নেই। তবে কোন কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে এই সকল মন্ত্র বার বার উচ্চারিত হলে এগুলি যজ্ঞকর্তাকে বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে। উপনিষদের মন্ত্র-আবৃত্তিতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয়।

১৫. ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা

প্রকৃতির নিয়ম-বন্ধনের অতীত–সর্বপ্রকারে স্বাধীন স্বতন্ত্র কাহারও সন্ধান লাভ করাই মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। বেদান্তবাদীরা এরূপ নিত্য শাশ্বত পুরুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও সাংখ্যবাদীরা বিশ্বাস করেন 'জন্য ঈশ্বর'-এ,–অর্থাৎ যিনি একদা মনুষ্য ছিলেন, তারপর আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে ঈশ্বরে পরিণত হয়েছেন। পুরাণসমূহে অবতারবাদের মাধ্যমে এই দুটি মতের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'জন্য ঈশ্বর' তো নিত্য (শাশ্বত) ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নন, মায়া দ্বারা তিনি কেবল এই প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। 'নিত্যঈশ্বর'-এর বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীরা যুক্তি দেনঃ 'মুক্ত আত্মা কি করে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে?' মিথ্যা ভিত্তির উপর সাংখ্যবাদীদের এই যুক্তি স্থাপিত। মুক্ত আত্মা তো কারও অধীন নয়, তাকে তো তুমি নির্দেশ দিতে পার না–এই কর বা এই কর না। সে মুক্ত, সে যা-ইচ্ছে করতে পারে। বেদান্তের মতে 'জন্য-ঈশ্বর' ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি বা লয় করতে পারেন না।

১৬. ঈশ্বরঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত

যাঁকে তোমরা ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন ঈশ্বর বল, আমার ধারণা তিনি এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্তা একই-কালে সাকার ও নিরাকার। আমরাও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। কথাটি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'অব্যক্ত', আর আপেক্ষিকভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'ব্যক্তি'। তোমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব- সত্তা, সকলেই সর্বব্যাপী। শুনলে প্রথমটা মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এ কথা যতখানি সত্য, ঐ কথাও ততখানি সত্য, আত্মা সর্বব্যাপী না হয়ে পারে কি করে? আত্মার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই—জড়ের কোন ধর্মই আত্মায় নেই। আমরা সবাই যদি আত্মা হই, তা হলে দেশ (space) দ্বারা পরিচ্ছন্ন হতে পারি না, দেশ দেশকেই সীমাবদ্ধ করতে পারে, জড় জড়কে; আমরা যদি শরীরে আবদ্ধ থাকতাম, তাহলে আমাদের জড়বস্তুই হতে হত। শরীর, আত্মা—সব কিছুই জড় হতে। 'শরীরে বাস করা', 'আত্মাকে শরীরে আটকে রাখা' প্রভৃতি কথাগুলি শুধু সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হত, এর অতিরিক্ত এদের কোন অর্থ থাকত না।

তোমাদের অনেকেরই মনে আছে—আত্মার কি সংজ্ঞা আমি দিয়েছি; প্রত্যেকটি আত্মা হচ্ছে এক-একটি বৃত্ত, একটি বিন্দুতে যার কেন্দ্র এবং যার পরিধি কোথাও নেই। কেন্দ্র হচ্ছে শরীরে, সেখানেই সব কর্মশক্তি প্রকাশিত। তোমরা সর্বব্যাপী, তবে সত্তাচেতনা একটি বিন্দুতে ঘনীভূত। সেই বিন্দুটি কিছু জড়কণা সংগ্রহ করে সেগুলিকে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রে পরিণত করেছে। যার মাধ্যমে সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে, তাকে বলে 'শরীর' ।

তা হলে তুমি সর্বত্র আছ। যখন একটি শরীর বা যন্ত্র আর কাজ করতে পারে না, তখন শরীরের কেন্দ্র 'তুমি' সরে যাও, আবার নতুন স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়কণা সংগ্রহ করে তাদের মাধ্যমে আবার কাজ করতে থাক। এই হল মানুষ। তা হলে ঈশ্বর কি? ঈশ্বর হচ্ছেন একটি বৃত্ত, যার পরিধি কোথাও নেই এবং যার কেন্দ্র সর্বত্র; এই বৃত্তের প্রতিটি বিন্দু চেতন ও সক্রিয়। সীমাবদ্ধ আত্মা আমাদের সঙ্গে সমানে কাজ করে চলেছে। আমাদের শুধু একটি চেতন বিন্দু, সেই বিন্দু একবার এগিয়ে চলেছে, একবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় শরীর যেমন অতি ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি নগণ্য। আমরা যখন বলি, ঈশ্বর কথা বলছেন, তখন তার অর্থ—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যমে বলছেন। আমরা যখন বলি—তিনি দেশ-কালের সীমার অতীত, তার অর্থ—তিনি ব্যক্তিত্বশূন্য সত্তা। এই উভয়ই এক সত্তা।

একটি দৃষ্টান্ত দিইঃ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখছি। মনে কর, তুমি সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছ। কয়েক হাজার মাইল কাছে গিয়ে দেখবে আর এর সূর্য—অনেক বড়। সবশেষে দেখবে, প্রকৃত সূর্য লক্ষ মাইল জুড়ে। এখন এই যাত্রাটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যাক, প্রত্যেক স্তর থেকে ছবি তোলা হল। প্রকৃত সূর্যেরও ছবি তুলে নিয়ে ফিরে এসে সবগুলি তুলনা কর, মনে হবে প্রত্যেকটি পৃথক্। প্রথম দেখা গিয়েছিল একটি ছোট লাল গোলাকার পদার্থ, এবং শেষে দেখা গেল লক্ষমাইল-ব্যাপী বিরাট প্রকৃত সূর্য। দুটি একই সূর্য।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। অসীম সত্তাকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্থান থেকে, মনের বিভিন্ন স্তর থেকে। নিম্নতম মানুষ দেখছে তাঁকে পূর্বপুরুষ-রূপে; দৃষ্টি যখন আরও বড় হল, তখন তাঁকে দেখছে একটি গ্রহের নিয়ন্তা-রূপে; দৃষ্টি আরও ব্যাপক হলে মানুষ বুঝতে পারে, তিনি বিশ্বের নিয়ামক। সর্বোচ্চ মানব অনুভব করেন, 'তিনি আমাদের স্বরূপ'। ঈশ্বর সর্বদা একই, তাঁকে যে বিভিন্নভাবে বোধ হয়, তার কারণ দৃষ্টির প্রভেদ ও তারতম্য।

১৭. ভগবৎ-প্রেম

[১৮৯৪, ১৫ ফেব্রুআরী আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরের ইউনিটারিয়ান চার্চে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।]

ভগবানকে আমরা মানি, যথার্থই তাঁকে চাই বলে নয়—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে দরকার বলে। প্রেম হচ্ছে এমন কিছু, যা সম্পূর্ণ স্বার্থহীন; এ প্রেম যাঁকে অর্পিত হয়, শুধু তাঁরই মহিমা ও স্তুতি ছাড়া তাতে অন্য কোন চিন্তার স্থান নেই। প্রেমের স্বভাব হচ্ছে প্রণতি আর পূজা, প্রতিদানে প্রেম কিছু চায় না। শুধু ভালবাসাই হল বিশুদ্ধ প্রেমের একমাত্র আবেদন।

একজন হিন্দু-সাধিকা২৬ সম্পর্কে এ-রকম শোনা যায়—বিবাহের পর তিনি তাঁর পতি রাজাকে বলেছিলেন, 'ইতিপূর্বেই আমি বিবাহিতা।' রাজা জিজ্ঞাসা করেন, 'কার সঙ্গে?' সাধিকা উত্তর দেন, 'ভগবানের সঙ্গে।' দীন-দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালবাসতে। তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা কত গভীর ছিল তা তাঁর প্রার্থনাগীতিগুলির একটি হতে জানা যায়ঃ 'আমি ধন মান কিছুই চাই না—এমন কি মুক্তিও চাই না; প্রভু, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে শত শত নরক-যাতনাও দিতে পার—তথাপি শুধু তোমাতেই আমার অনুরাগ দাও।' আমাদের প্রাচীন ভাষা এই সাধিকার মধুর ভজনাবলীতে পূর্ণ। তাঁর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তখন এক নদীর তীরে গিয়ে তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। এক মর্মস্পর্শী সঙ্গীতে তিনি ব্যক্ত করে যান যে, তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্যই তিনি যাত্রা করেছেন।

পুরুষেরা ধর্মের দার্শনিক বিচারে সমর্থ। নারী স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ; সে ভগবানকে ভালবাসে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, বুদ্ধি দিয়ে নয়। সলোমনের প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি বাইবেলের চমৎকার অংশগুলির অন্যতম। এগুলির ভাবও অনেকটা ঐ হিন্দু-সাধিকার ভজনগীতের মত অনুরাগে পূর্ণ। তথাপি শুনেছি, এই অতুলনীয় সঙ্গীতগুলি খ্রীষ্টানরা নাকি

বাইবেল থেকে বাদ দিতে চাচ্ছেন। এর একটা কৈফিয়তও আমি শুনেছি—সলোমন নাকি কোন যুবতীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং যুবতীর কাছ থেকে তাঁর রাজোচিত প্রেমের প্রতিদান চেয়েছিলেন। যুবতী অন্য কোন যুবককে ভালবাসত, সলোমনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চাইত না। এ কৈফিয়তটি কারও কারও কাছে হয়তো ভালই লাগবে, কারণ এ-সব ভজনগীতের অন্তর্নিহিত ভাব—অলৌকিক ভগবৎ-প্রেম—তারা বুঝতে অক্ষম। ভারতের ভগবদ্ভক্তি অন্যান্য দেশের ভগবদ্ভক্তি থেকে কিছু স্বতন্ত্র, কারণ যে-দেশের তাপমান-যন্ত্র শূন্যের নীচে ৪০ ডিগ্রী সূচিত করে, সে দেশের লোকের প্রকৃতিও কিছু ভিন্ন ধরনের হয়। যে-জলবায়ুতে বাইবেল রচিত হয়েছিল বলে শোনা যায়, সেখানকার লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা—যারা ঈশ্বরোপাসনার চেয়ে সঙ্গীতগুলিতেও ব্যক্ত হৃদয়াবেগ দিয়ে সর্বসিদ্ধিপ্রদ অর্থের পূজা করতেই অধিকতর অভ্যস্ত—সেই-সব আবেগশূন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি থেকে পৃথক্ ছিল। ‘এতে আমার কি লাভ?’—এটাই যেন ভগবদ্ভক্তির ভিত্তি। প্রার্থনাদিতে তারা শুধু স্বার্থপূর্ণ বিষয়গুলিই কামনা করে।

খ্রীষ্টানরা সর্বদা চান, ভগবান্ তাঁদের কিছু না কিছু দিন। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সিংহাসন-সমীপে তাঁরা ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত হন। গল্পে আছে—এক ভিক্ষুক কোন সম্রাটের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েছিল। ভিক্ষুক যখন অপেক্ষা করছিল, সম্রাটের তখন প্রার্থনার সময়। সম্রাট্ প্রার্থনা করছিলেনঃ ‘হে জগদীশ্বর, আমাকে তুমি আরও ঐশ্বর্য দাও, আরও শক্তি দাও, আরও বড় সাম্রাজ্য দাও।’ ভিক্ষুক এই শুনে চলে যাচ্ছিল। সম্রাট্ পিছনে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, ‘চলে যাচ্ছ কেন?’ উত্তর হল, ‘ভিক্ষুকের কাছে আমি ভিক্ষা চাই না।’

যে তীব্র আধ্যাত্মিক উন্মাদনা মহম্মদের হৃদয় আলোড়িত করেছিল, অনেকের পক্ষেই তা বোঝা কঠিন। তিনি ধুলোয় গড়াগড়ি দিতেন এবং বিরহ-যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। যে-সব লোকোত্তর পুরুষ এরূপ তীব্র হৃদয়াবেগ অনুভব করেছেন, লোকে তাঁদের বায়ুরোগগ্রস্ত বলেছে। অহং-শূন্যতাই ঈশ্বরানুরাগের প্রধান লক্ষণ; ধর্ম আজকাল মানুষের এক-রকম শখ বা বিলাসমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে গির্জায় যায় গড্ডলিকা-প্রবাহের মত; তারা ভগবানকে স্বেচ্ছায় বরণ করে না, তারণ তাঁর সঙ্গে তো তাদের প্রয়োজন বা স্বার্থের

সম্বন্ধমাত্র। অধিকাংশ লোকই একরকম প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, অথচ নিজেদের খুব ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে।

১৮. মাতৃভাবে উপাসনা

[১৯০০, জুন মাসে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত লিপির অনুবাদ।]

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠী-দেবতার ভাব হইতে তাহাদের সমষ্টি পরমেশ্বর-ভাবে উপনীত হইয়াছে; একমাত্র কন্‌ফিউসিয়াস চিরন্তন একটি নীতির কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। মনুদেবতা আহ্‌রিমানে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ভারতে পুরাণের গল্প চাপা পড়িয়াছে, তাহার ভাব রহিয়া গিয়াছে। ঋগ্‌বেদেই একটি মন্ত্র২৭ পাওয়া যায়, 'অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্—' ।

মাতৃ-উপাসনা একটি স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের অনুভূত বিবিধ ধারণার মধ্যে শক্তির স্থান সর্বপ্রথম। প্রতি পদক্ষেপে ইহা অনুভূত হয়। অন্তরে অনুভূত শক্তি—আত্মা, বাহিরে অনুভূত শক্তি—প্রকৃতি। এই দুই-এর সংগ্রামই মানুষের জীবন। আমরা যাহা কিছু জানি বা অনুভব করি, তাহা এই দুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মানুষ দেখিয়াছিল, ভাল এবং মন্দ—উভয়ের উপর সূর্যের আলো সমভাবে পড়িতেছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ এক নূতন ধারণা—এক সার্বভৌম শক্তি সব কিছুর পশ্চাতে। এই ভাবেই মাতৃভাব উদ্ভূত।

সাংখ্য-মতে ক্রিয়া প্রকৃতির ধর্ম, আত্মা বা পুরুষের নয়। ভারতে নারীর সর্ববিধ রূপের মধ্যে মাতৃমূর্তি সবার উপরে। মা সর্বাবস্থায় সন্তানের পাশে পাশে থাকেন। স্ত্রী-পুত্র মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে, মা কিন্তু কখনও সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারেন না। আবার মাতৃশক্তিই পক্ষপাতশূন্য মহাশক্তি। মায়ের স্বচ্ছ স্নেহ প্রতিদানে কিছু চায় না, কিছু কামনা করে না, সন্তানের দোষগুলি গ্রাহ্য করে না—সে জন্য বরং আরও বেশী ভালবাসে। বর্তমানে মাতৃ-উপাসনা উচ্চস্তরের হিন্দুদের সাধনার প্রধান অঙ্গ।

যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই, তাহাকেই 'লক্ষ্য' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। মাতৃ-সাধনায় লক্ষ্য বলিয়া কিছু নাই। সব কিছু মায়ের খেলা, কিন্তু ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। স্বার্থবোধ না থাকিলে দুঃখও আনন্দের অনুভূতি আনিতে পারে, যদি আমরা আমাদের জীবনের

সাক্ষিরূপে পরিণত হই। জগদ্-ব্যাপারের পিছনে একটি শক্তি ক্রিয়াশীল, এই ধারণাই এই ভাবের সাধককে বিস্মিত করে। আমাদের ধারণা—ঈশ্বর মানুষের মত সসীম ও ব্যক্তিত্ব-যুক্ত। শক্তির সঙ্গে এক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ধারণা আসে। শক্তি বলিতেছেন, 'আমি রুদ্রের জন্য ধনু বিস্তৃত করি, যাহাতে তিনি ব্রহ্মদ্বেষীকে ধ্বংস করিতে পারেন।'২৮ উপনিষদে এই ভাবের চিন্তা নাই, বেদান্ত এই বিষয়ে বেশী অগ্রসর হন নাই—ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিঃ 'সদসচ্চাহমর্জুন'—আমি ব্যক্ত, আমিই অব্যক্ত; ভাল মন্দ—সবই আমার সৃষ্টি।

এই ভাব কিছুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে আবার দেখা দেয় নূতন দর্শন। এই জগৎ সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ—উভয়ের মধ্য দিয়া একই শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিশ্বজগতের আংশিক অনুভূতি হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহাও আংশিক মাত্র। সহানুভূতির অভাবে এই ধারণা মানুষকে পশুভাবাপন্ন ও হিংস্র করিয়া ফেলে। এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি পশুর ধর্ম।

সাধু পাপীকে ঘৃণা করে, আবার পাপীর বিদ্রোহ পুণ্যবানের বিরুদ্ধে। এই ভাবও অবশ্য তাহাকে আগাইয়া লইয়া যায়। বারংবার আঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া দুষ্ট স্বার্থপর মন মরিয়া যায়—তখন আমরা জাগিয়া উঠি এবং মায়ের সত্তা অনুভব করি।

মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাস—ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার আশায় নয়। তাঁহাকে ভালবাস, কারণ তুমি সন্তান। ভালয় মন্দে—সর্বত্র তাঁহাকে সমভাবে দেখ। যখন আমরা তাঁহাকে এইরূপে অনুভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব ও চিরশান্তি—ইহাই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভূতি না হয়, ততদিন দুঃখ আমাদের অনুসরণ করিবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমরা নিরাপদে থাকি।